বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা

হরপ্রসাদ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
করকমলেষু

সূচী

ভারত-সাধকের বিশ্বভাবনা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দের অভ্যুদয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। দেশ-জাতি-ব্যক্তি তাঁর মধ্যে যেন একযোগে গভীর এক সার্থকতায় পৌঁছেছিল। সেই স্ফুরণের কথা ভাবতে গেলে উপনিষদের কথা মনে পড়ে। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীতে দেখা যায়—

> অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
> ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।

অর্থাৎ, দেহাভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই অতীত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। হৃদয়ে যখন এই বোধ জাগে, তখন আর আপনাকে রক্ষার জন্য লোকে ব্যাকুল হয় না!

এ জ্ঞান লোককল্যাণের নিয়ন্তা। ব্যক্তিগত সাধনা যখন এই জ্ঞানে এসে পৌঁছোয়, ব্যক্তির অহং-বুদ্ধি তখন আর ব্যক্তির একান্ত সংকোচে বন্দী থাকে না। ব্যক্তিতে-বিশ্বে তখন গভীর যোগ ঘটে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাই ঘটেছিল। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি নানা চিন্তাই তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এগুলির কোনো একটিরই একান্ত সাধক নন। তাঁর সম্বন্ধে একটি মাত্র বিশেষণ ভেবে ওঠা সম্ভব নয়। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পরম সমষ্টিচেতনার সাধনা বললে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই-ই। মূলতঃ তিনি ছিলেন ভাবনেতা।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে নানা মনীষীর সাধনায় পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং এঁদেরই অল্পবিস্তর সমসাময়িক অনেকে সে চেষ্টায় যোগ দেন। এই শক্তির সাধক হিসেবেই ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাবটি প্রকাশ করে গেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর এই কাজই পরে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির কাজ হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় কিছু কিছু গদ্য-পদ্য লিখলেও প্রধানতঃ সাহিত্যসেবী ছিলেন না তিনি। আধ্যাত্মিক সাধনাই ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তবু তাঁর সেই কর্মসূত্রেই তিনি যা কিছু বলে গেছেন, লিখে গেছেন, সে-সবের মধ্যে কোথাও কোথাও বিশিষ্ট একটি শিল্পি-মনের গভীর এবং অকৃত্রিম ছাপ থেকে গেছে। সাহিত্য তাঁর ভাবসাধক ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক একটি দিক মাত্র। সেই দিকটির পরিচয় দিতে হলে স্বভাবতই তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আস্বাদনের চেষ্টা অপরিহার্য।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি 'বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়' সম্পর্কে ক্যালিফোনিয়ায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলে গেছেন—'আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্ম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে।'—পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্মমতগুলির মধ্যে প্রবল জীবনীশক্তি যে বিদ্যমান,—এ ছিল তাঁর নিজস্ব অনুভূতি। ধর্মমতের বিভিন্নতা আর ধর্মের জীবনীশক্তি, দুই-ই সত্য। জাতির সংঘ-সত্য আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, দুই-ই অটুট। ঐ বক্তৃতাতেই তিনি যা বলেছিলেন তার বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—

> 'আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে যত মানুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।'

জীবনে ভেদবুদ্ধি থেকে ঐক্যবোধে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। সংসারে সাধারণ ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে চেতনায় টিঁকে আছি, সেখান থেকে ত্রিকালের নিয়ন্তার উপলব্ধিতে পৌঁছোনো অসম্ভব নয় বটে, তবে তা নিতান্তই কৃপাসাধ্য ব্যাপার বলে শোনা যায়। মানুষ সেই সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভালবাসে। সাধারণ লোকজীবনে সে ভালোবাসাও হয়তো কল্পনার বিলাসমাত্র! মন্ত্রের সাধন কখনোই অলসের সাধ্য নয়।

বিবেকানন্দ তাই বার বার আমাদের আলস্য দূর করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। 'ধর্ম'-ই বা কি—আর 'মোক্ষ'-ই বা কি? এই দুটি বহুব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে তিনি লেখেন—'আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার

প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের'। 'ধর্ম' আর 'মোক্ষ' শব্দদুটির তিনি অর্থ ব্যাখ্যা করেন এইভাবে—

> 'ধর্ম কি ?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হয়েছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।
>
> মোক্ষ কি ?—যা শেখায়, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।'

কিন্তু দেশের লোককে শুধু আলস্য দূর করে সুখভোগের ধর্মেকর্মে লিপ্ত থাকতে বলেননি তিনি। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে—এই ছিল তাঁর সন্ন্যাসের মর্ম।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি লিখে গেছেন—'তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন।'

তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে সেই সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে বৌদ্ধযুগে। অতঃপর ধর্ম অনাদৃত হয়ে মোক্ষমার্গই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘকালের এই দুরবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আত্মচিন্তা উদ্বোধিত করে তিনি আরো লেখেন—'যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই, কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।'

বৌদ্ধযুগের সেই অবস্থার দিকেই তর্জনী সংকেত করে তিনি জানান—

> 'জাতি-ব্যক্তি প্রকৃতিভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর করে এক করতে গেলে কি হবে ? বৌদ্ধরা বললে, মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল। বলি, তা কখন হয় ? তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশি আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর—একথা বলেছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে।'

সহজ ভাষায়, সাধারণ লোকমনের সামনে তিনি তাঁর প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—

> 'দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পারনা—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ।'

তাঁর মন্তব্য তাই হিন্দুশাস্ত্রেরই অনুকুলে—

> 'ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা, বড় কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।'

এই বলে, তিনি মনুর কথা স্মরণ করেন।

তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন—'যত মত তত পথ।' বিবেকানন্দ সেই উদারপন্থী গুরুর শিষ্য। তিনি মূলতঃ বৌদ্ধকে হীন কিংবা হিন্দুকে উন্নততর বলেন নি। এ বিষয়ে তাঁর কথা বরং এই—

> 'বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়।'

বলেছেন,—

> 'জাতি-ধর্ম স্বধর্ম-ই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়—মুক্তির সোপান।'

আবার খ্রীষ্টান ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করে তিনি দেখান যে, যীশু উপদেশ দিলেন নির্বৈর হতে, কিন্তু ইউরোপ তার বিপরীত আচরণেই অভ্যস্ত। সে যেন কতকটা আমাদেরই গীতার উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের ইউরোপকে দেখে তাঁর মনে হয়, জাবনের যাবতীয় আচরণে ইউরোপ যেন ক্লৈব্য পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা আমাদের লোক-সাধারণের জীবনে কি সার্থক হয়েছে? অথচ আমাদেরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই বিশেষ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের কথায়—'ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর।'

তার কারণ কি? কারণ, আমরা জাতিধর্ম ভুলেছি।

ভারতবর্ষের সেই বিশেষ জাতিধর্ম বা জাতীয় উদ্দেশ্যটি কি?

ফরাসী, ইংরেজ এবং হিন্দুর তুলনা করে তিনি জানান যে, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড',—ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান,—আর—

> 'হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'।

জাতীয় আদর্শের দিক থেকে বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ—বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মমতের ঐক্য অনুভব করা যায় এইখানে। অথচ মূলতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার তাগিদ বা ব্যবসাবুদ্ধির তাগিদ যে সামান্য তাগিদ, তা নয়। স্বামীজীর কথায়—

> 'অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর, হিন্দুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে।'

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবটির উপলব্ধি তাঁর বেদান্ত-উপলব্ধির সঙ্গে এক যোগে বিদ্যমান ছিল। বিশ্বমানবের কল্যাণ-চিন্তা এবং স্বাদেশিকতা—তিনি ছিলেন এই দুইয়েরই সম-সাধক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের জীবন-দৃষ্টির এই একান্ত অভিন্নতাও স্মরণীয়। 'বর্তমান ভারত'-এর 'স্বদেশমন্ত্র',—আর,তারই মাত্র কয়েক বছর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধের [মাঘ ১২০৯] শেষ দিকে 'ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ'-এর উদ্দেশে গভীর প্রার্থনার সুরে একই ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারিত হয়। ভারত-শরীরে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষরূপে যিনি বিদ্যমান, অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের নিয়ন্তা সেই দেবতাকে এঁরা বন্দনা করে গেছেন।

অন্বয়দৃষ্টি ও আত্মসন্ধান

১৮৬০ থেকে ১৮৮০,—সেকালের শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে এই বিশ বছরের প্রধানতম আধ্যাত্মিক আন্দোলন মানে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎসাহ উদ্দীপনা, সামর্থ্য বা বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। সাহিত্যে মধুসূদন, দীনবন্ধু. বঙ্কিম, গিরিশ প্রভৃতি ছিলেন; সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের নাম অবিস্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দুটি খণ্ডই বেরিয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দু'খণ্ড বের হয় যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ইত্যাদি বক্তৃতাগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামে ১৮৬১-তে সংকলিত হয়। সেই বছরেই রাজনারায়ণ বসুর 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' ছাপা হয়। তাঁর বক্তৃতা বেরোয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে; 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' ছাপা হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ রচিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৭০-এ, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮০-তে। এ ছাড়া আরো নানা রচনা, নানা চিন্তা এবং ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞানের সন্ধানে, কর্মবৈচিত্র্যের উদ্দীপনায়, সৃষ্টির বিবিধ প্রেরণায় সেই যুগটি ছিল বিশিষ্টতা-চিহ্নিত।

বিবেকানন্দের শৈশব, বাল্য, কৈশোর কেটেছে সেই পর্বে। সে-পর্বে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন আর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম সর্বপ্রধান। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে বিলেত যাত্রা করেন। মনোমোহন ঘোষ তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। কেশবচন্দ্র বিলেতে গেছেন ১৮৭০-এ; তার আগেই ১৮৬৬-তে তাঁর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিলেত থেকে ফিরে তিনি *Indian Reform Association* গড়েছেন, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ্যালবার্ট হল স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র জনগণের ঐক্যজাগৃতির জন্যে দয়ানন্দকে হিন্দি শিখে নিতে উৎসাহিত করেছেন

তিনি। প্রতাপ মজুমদার পর-পর চারবার বিলেতে-আমেরিকায় গেছেন —১৮৭৪-এ, '৮৩-তে, '৯৩-এ এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। যে-বছর কেশবচন্দ্র বিলেত যান, সেই ১৮৭০-এ বালক নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিট্যুশনে ভর্তি হন। ১৮৭৮-এ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' জন্মগ্রহণ করে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-আর শিবনাথ শাস্ত্রী সে-সমাজের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে-সভার সদস্য। কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রবেশিকার আগে থেকেই আহ্‌ম্মদ খান আর বেণী গুপ্ত, এই দুই ওস্তাদের কাছে কণ্ঠ-সংগীত আর যন্ত্র-সংগীতের পাঠ নেন। কলেজে পড়বার সময়ে বন্ধুমহলে বেশ জনপ্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। তখন খুব চা আর কফি খেতেন। ঘোড়া-চড়বার ঝোঁক ছিল। হার্বার্ট স্পেন্সারকে চিঠি লিখেছিলেন একবার। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিট্যুশনের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব তাঁকে ভালোবাসতেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্নরেন বাঁড়ুজ্যে যখন মাৎসিনি-গারিবলডির কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, নরেন্দ্রনাথ তখন সে সব বক্তৃতা শুনতে যেতেন।

নবগোপাল মিত্র ছিলেন ঠনঠনে মিত্র পরিবারের সন্তান; শিমুলিয়ার দত্ত-বাড়ির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল,—দত্তদের দৌহিত্র তিনি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখে গেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ সে সময়ে নবগোপাল আর কেশবচন্দ্রের প্রভাবের মধ্যেই যৌবন উদ্‌যাপন করেছেন। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর নিরন্তর বিদ্যার্জনে আর বুদ্ধিচর্চায় কেটেছে।

মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়—বিবেকানন্দ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও খুব-ই পড়তেন। সেই সত্তরের দশকে, ১৮৭৫ থেকে কেশবচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ সাধক-ভাবের কথা লিখতে শুরু করেন। শোনা যায়, 'পরমহংস' অভিধাটি নাকি ব্যাপক অনুরাগিসমাজে প্রথম কেশবচন্দ্রেরই প্রবর্তনা। তাঁরই বাংলা পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব'-তে ১৮৭৫-এর ১৪ই মে ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনী ছাপা হয়। কেশবচন্দ্র আর অধ্যক্ষ হেস্টির লেখালেখির ফলেই রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত-সমাজ প্রথম অবহিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ও ১.ই ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় সাধক রামকৃষ্ণের কথা ছিল।

১৮৭৯-তে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮০-তে প্রেসিডেন্সি

কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলেজে যেতেন কালো আল্পাকার চাপকানের সঙ্গে ট্রাউজার পরে,—কব্জীতে বাঁধতেন রিষ্টওয়াচ। কলেজের দ্বিতীয় বছরে পড়বার সময়ে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। তখন শরীর সারিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্যে গয়ায় গিয়েছিলেন। পার্সেন্টেজ কম ছিল বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাঁকে এফ্-এ পরীক্ষায় বসতে দিতে বাধা ওঠে। তখন জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশনে চলে যান। সেই সময়ে পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে নরেন্দ্রনাথ আর পাঁচজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবযুবকের মতোই বিলেতে যাবার অভিপ্রায় জানান। কিন্তু বিশ্বনাথ রাজী হন নি। তিনি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে চান নি। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন নরেন্দ্রনাথের একই কলেজের প্রবীণতর ছাত্র। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনিই বলে গেছেন এসব কথা।

১৮৮৩-তে বি, এ, পাশ করে, ১৮৮৪-তে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিট্যুশনের আইন-বিভাগে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিট্যুশনে পড়বার সময়েই কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তারপর, দক্ষিণেশ্বরে যান। ১৮৮২-র ৫ই, ৬ই মার্চ তারিখে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ প্রসিদ্ধ। 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' গানটি তিনি গেয়ে শোনান। সেই গান শুনে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়।

নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হন। সেই অবস্থায় একবার গিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। তারপর যান রামকৃষ্ণের কাছে।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৬,—এই চার-পাঁচ বছরই রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার কাল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, গুরু রামকৃষ্ণের শেষ অসুখে সেবার দায়িত্ব উপলক্ষ করে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রস্তুতি দেখা দেয়। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কলকাতায় শ্যামপুকুরে, পরে কাশীপুরের বাগান-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা সেই সেবার ব্রতে সম্মিলিত হন। এই কাশীপুর-বাগানবাড়ি থেকেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সংঘের সেবাব্রত রূপ নিতে থাকে। তাঁদের কর্মসূচী পরে সুচিহ্নিত হয় বটে, কিন্তু তখন থেকেই তার সূত্রপাত ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

প্রথমে মঠ গড়ে ওঠে বরানগরের এক ভাঙ্গা বাড়িতে ;—বছর-ছয়েক পরে সেখান থেকে আলমবাজারে,—তারপর বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফেরবার পরে বেলুড়ে এই মঠ স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট, সোমবার প্রত্যুষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হন। তিনি লোকান্তরিত হবার আগেই নরেন্দ্রনাথের একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়। সেই বছরেই বড়দিনের সময়ে ভক্তমণ্ডলীর এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সে-সময়ে এইসব সাধক-ভক্তের মধ্যে কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সারদা দেবীর সঙ্গে তখন কোনো কোনো ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। যোগানন্দ আর লাটুমহারাজই ছিলেন সে-কালের রামকৃষ্ণসংঘের প্রধান কর্মী। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বিরজা হোম করে যথারীতি সন্ন্যাস নেন আরো কিছু পরে।

১৮৮৮ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ বরানগরেই বাস করেন। তবে, সেই বছরেই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে বারাণসী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন হাথরাস ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে আসেন। হাথরাসের স্টেশন-মাষ্টার ছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত। নরেন্দ্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্টেশনে নামলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। চাকরি এবং সংসার ছেড়ে,—ফার্শী ভাষায় এবং সুফী-দর্শনে অভিজ্ঞ শরৎচন্দ্র গুপ্ত 'সদানন্দ' নামে পরিচিত হন ; রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন যে, এই সদানন্দ ছিলেন Franciscan Grace-এর প্রতিমূর্তি।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবার ভ্রমণে বেরোন। সেবার তিনি যান গাজিপুরে। রোলাঁর মতে,—গাজিপুর-পর্বটিতেই তিনি মানবকল্যাণচিন্তা বা লোকহিতচর্চার আসল আদর্শের দেখা পান। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথও তখন গাজিপুরে; সেখানে তাঁর 'মানসী'-র কবিতাগুলি লেখা হয়। কিন্তু সে-সময়ে রবীন্দ্র-নরেন্দ্র সাক্ষাতের কোনো উল্লেখ নেই কোথাও। যাই হোক্‌, ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের জন্যে তিনি গাজিপুরে আর এলাহাবাদে যান। এই সব ঘটনার মধ্যেই হিন্দু-বিশ্বাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে তিনি অন্বয় উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। ১৮৯০-এর জুলাই মাসে তিনি বরানগর ছাড়েন। ১৮৯৭-এ বিদেশ থেকে ফেরবার আগে তিনি আর মঠে ফেরেন নি।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হবার পরে, সেই সময়ে গভীরভাবে তিনি নির্জনতা খুঁজছিলেন। আত্মানন্দ তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যান, গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলমোড়ায় সারদানন্দ আর কৃপানন্দের দেখা পান তিনি। তুরীয়ানন্দও এসে পৌঁছোন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-র শেষদিকে তাঁদের মীরাটে রেখে নরেন্দ্র চলে যান। মীরাট থেকে তিনি দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছোন। অভিপ্রেত নিঃসঙ্গতায় এইভাবে বাধা পড়ায় নরেন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁদের বকাবকি করেন। তারপর ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী ত্যাগ করে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে 'ডিপথিরিয়া' রোগে তাঁকে খুবই বিপন্ন হতে হয়। কিন্তু কিছুতেই পেছিয়ে যাবার মানুষ ছিলেন না তিনি।

১৮৯১ থেকেই তাঁর পরিব্রাজক-জীবন, কর্ম-ব্যাকুলতা, নির্জনতা-প্রীতি, এবং জ্ঞান আর কর্মের ঐক্যসন্ধান তীব্র হয়ে ওঠে। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় যান রাজপুতানা, আলওয়ার,—তারপর জয়পুর আজমীর, খেতড়ী, আহমেদাবাদ, কাথিয়াবাড়, জুনাগড় ও গুজরাট; পোরবন্দরে প্রায় আট-ন মাস কাটিয়ে দ্বারকায় পৌঁছোন; বরোদা রাজ্যে যান,—খাণ্ডোয়া হয়ে, বোম্বাই হয়ে যান পুনায়; ১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে বেলগাঁও পৌঁছে, সেখান থেকে মহীশূরে বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরা দেখে রামেশ্বরে,—এবং সেই ১৮৯২-এর শেষদিকে পৌঁছেছিলেন কন্যাকুমারীতে। ১৮৯১-এর এপ্রিলে খেতড়ীর মহারাজার সঙ্গে বাস করেন তিনি। হিমালয়ে তিব্বতীদের সঙ্গেও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। কন্যাকুমারী থেকে রামনাদ এবং পণ্ডিচেরি হয়ে তিনি মাদ্রাজে যান। মহীশূরের এবং রামনাদের রাজারা তাঁর মুগ্ধ শিষ্য তখন। সেই পর্বেই ১৮৯২-এর প্রথম দিকেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্য জগতে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন তিনি।

কর্ম আর জ্ঞান, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই দুটি ক্ষেত্র যেন এক হয়ে দেখা দিয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: 'Naren with whom dream itself was action'! ১৮৯৯খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বাগবাজার থেকে

কাশী-নিবাসী প্রমদাদাস মিত্রকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর মা আর দুই ভাইয়ের তখনকার দুরবস্থার কথা লেখেন। তাঁর পিতৃবিয়োগের পরে, খুবই অশান্তি-জনক পরিস্থিতিতে তাঁদের দিন কাটাতে হয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি জানান: 'ইহাদের অবস্থা পুর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।' পারিবারিক ক্ষেত্রে এই দুঃখ দেখে তাঁর মনে 'রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়'—এবং সেই কথা স্মরণ করেই 'গীতা'-র শ্লোক উল্লেখ করে প্রমদাদাসকে তিনি আরো লেখেন—'আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূর-পরাহত হইয়া যায়…।'

নরেন্দ্রনাথের সেই চিঠিতেই তাঁর তখনকার নিত্যসঙ্গী গীতা, আর *Imitation of Christ*,—দুয়েরই উল্লেখ ছিল। গীতা থেকে তিনি স্মরণ করেন:

> আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
> তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ সমুদ্রে অজস্র জলধারা প্রবেশ করলেও সমুদ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি যাঁর মধ্যে অজস্র কামনা প্রবেশ করে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন; যিনি সকাম কর্মে নিযুক্ত, তিনি অশান্ত।

আর, ***Imitation of Christ*** থেকে তিনি স্মরণ করেন: 'We have taken up the Cross. Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen'!

এই চিঠির পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর-আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে তিনি লেখেন—'যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও'। জনকল্যাণের কর্মী যাঁরা, তাঁদেরই কথাপ্রসঙ্গে শিবানন্দকে সেই চিঠিতেই তিনি ইংরেজিতে যা লেখেন, তার বঙ্গানুবাদ এই—'যে কোন ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়।'

রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই প্রেমের গুণেই তিনি তাঁর 'কেনা গোলাম' হয়েছিলেন! শিবানন্দকে তিনি লেখেন: 'ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই'; আবার—'দাদা, বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India'! এর পরেই আবার বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে লেখেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক! তিনি কি নামের দাস? ভায়া, যীশুখ্রীষ্টকে জেলে মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে, বুদ্ধকে বেনেরা খালি তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে'।

এখানে এবং অন্যত্র এই রকম আরো কোনো কোনো উক্তিতে স্পষ্টই কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি সাধক মনীষীর প্রতিই ইঙ্গিত বোঝা যায়। উনিশ শতকের সেই অন্বয়গুণটিই বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের যোগ্য ভূমিকা। উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সরল পল্লীবাসী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মধ্যে অলৌকিক ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি দেখে যে অভিভূত বোধ করে, এই সত্যটি তিনি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে যান। আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। ১৩৫৫ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 'পত্রাবলী'-র প্রথম চিঠি সেই আঁটপুর থেকে লেখা—মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশ্যে। নরেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—'আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে'।

১২ই আগষ্ট ১৮৮৮ থেকে শুরু করে ৪ঠা জুন ১৮৯০ পর্যন্ত প্রায় দু'বছরের মধ্যে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয় প্রথম খণ্ডে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের উল্লেখ আছে এই সব চিঠির মধ্যে, আবার কখনো বরানগর মঠ থেকে, কখনো বা বাগবাজার থেকে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে রামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর বেদান্ত-পাঠ, পাণিনি-ব্যাকরণচর্চা ইত্যাদির কথা আছে। ১৯-এ নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে, মঠ থেকেই তিনি কাশীপ্রবাসী প্রমদাদাসকে জানিয়েছিলেন: 'এই মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি'। বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার অভিপ্রায়েই তাঁরা পাণিনি পড়তে আগ্রহী হন।

প্রমদাদাস সেই সময়—সম্ভবতঃ ১৮৮৯-র প্রথম দিকেই নরেন্দ্রনাথকে কাশীতে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, গুরুদেবের জন্মভূমি দেখতে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ পথে রোগাক্রান্ত হন। প্রথমে জ্বর হয়, তারপর ভেদবমি। সেবারে তাই আর কাশী যাওয়া হয়নি। ২১-এ মার্চ ১৮৮৯ তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেন—'অধুনা কাশী যাইবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীরগতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে'।

জ্ঞানানন্দ তখন কাশীতে। রাখাল আর সুবোধ—দুই গুরুভ্রাতা কাশীতে যান ঐ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে। গঙ্গাধর এবং আর চারজন ভক্ত তখন উত্তরাখণ্ডে। গঙ্গাধর তিব্বতে ঘুরে আসেন। তিনি ভূটানেও গিয়েছিলেন। কেদারনাথ-তীর্থের পথে শ্রীনগরে শিবানন্দ নামে নরেন্দ্রনাথের

এক গুরুভ্রাতার সঙ্গে গঙ্গাধরের দেখা হয়। তিব্বতীরা ফিরিঙ্গির চর মনে করে গঙ্গাধরকে কেটে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোনো কোনো লামার করুণায় তিনি বেঁচে যান!

১৮৮৯-এর ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন যে, শিমুলতলায় তাঁর পূর্ব-অবস্থার এক আত্মীয় একখানি বাড়ি কিনেছিলেন এবং সে-বাড়িতে ঐ সময়ে নরেন্দ্রনাথ নিজের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত গরমের ফলে উদরাময় দেখা দিতেই তিনি শিমুলতলা পরিত্যাগ করেন। সেই চিঠিতে নরেন্দ্রনাথের নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঈষৎ উল্লেখ ছিল। নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজের তথনকার স্মরণীয় মন্তব্য বলেই সে-অংশটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য:

'ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৫।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট'।

হাইকোর্টে মকদ্দমার খরচ যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে, নরেন্দ্রনাথের মা আর ভাইয়েরা পৈতৃক বাড়ির ভাগটুকুই শুধু পেয়েছিলেন! সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। সেবার সেই মকদ্দমা শেষ হয়ে গেলে তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করেন। প্রমদাদাসের আশীর্বাদ কামনা করে তিনি সংসারের চিন্তা থেকে 'চিরদিনের মত বিদায়' প্রার্থনা করেন। তখন নরেন্দ্রনাথের ঠিকানা ছিল—বলরাম বসুর বাড়ি, ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংসারের নানা দুঃখে তাঁর মনে তখন একদিকে কতকটা অভিভূত ভাব, আর কতকটা আধ্যাত্মিক সত্য-জিজ্ঞাসা, দুই-ই কাজ করেছে। প্রমদা-

দাসের সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। সে-সময়ের এক চিঠিতে প্রমদা-দাসের কাছে তিনি বারো দফা প্রশ্ন জানিয়েছিলেন। সে-চিঠির তারিখ, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯। সে-সব প্রশ্ন গভীরভাবে তাঁরই ভাবজীবনের সঙ্গে জড়িত! যেমন, একটি প্রশ্নে তিনি জানান: 'যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শোনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?' চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রমদাদাসের সঙ্গে তাঁর আরো অনেক আলোচনা হয় সে-সময়ে। শঙ্করের বিবর্তবাদ,—জার্মান Transcendalist-দের সম্বন্ধে স্পেন্সারের বিদ্রূপ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি নানা মত, নানা দৃষ্টির কথা উঠেছিল।

১৮৮৯-এর ডিসেম্বরের শেষদিকে তিনি বৈদ্যনাথে পূর্ণবাবুর বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে কাশী যাত্রা করেন, কিন্তু গুরুভ্রাতা যোগেন্দ্র তখন চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথ ইত্যাদি দেখে, প্রয়াগে পৌঁছে, বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁরই সেবা-শুশ্রূষার জন্যে নরেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। ৩০-এ ডিসেম্বর সেই প্রয়াগধাম থেকেই প্রমদাদাসকে পুনরায় তিনি এক চিঠি লেখেন। এই এলাহাবাদে অবস্থানের সময়ে তিনি চক-অঞ্চলে ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে বাস করেন।

১৮৯০-এর ২১-এ জানুয়ারি তিনি গাজিপুরে গিয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। গাজিপুরে পওহারী বাবাকে দেখবেন বলেই সেবার গাজিপুরে যাওয়া। পওহারী বাবা থাকতেন উঁচু পাঁচিলে-ঘেরা এক বাড়িতে; বাড়ির বাইরে আসতেন না। তিনি,—দরজায় দাঁড়িয়ে, ভেতর থেকেই নিজের ইচ্ছেমতন কখনো কখনো কারো কারো সঙ্গে কথা বলতেন মাত্র। ৩১-এ জানুয়ারির এক চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন যে, বাবাজীকে দেখবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু দেখা মেলে নি। তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০-এর চিঠিতে বাবাজীর দর্শনলাভ,—তাঁর মহাপুরুষভাব সম্বন্ধে নিজের সংশয়মোচন ইত্যাদির স্বীকৃতি ছিল। তাঁর নিজের কথায়—'ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন'। সে-চিঠিতে তিনি আরো লিখে গেছেন: 'আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না'। সেবার তাঁরই আজ্ঞা-মতন

কিছুকালের জন্যে নরেন্দ্রনাথ সেখানে বাস করেন। আর, তিনি নিজে একথাও লিখে গেছেন যে, 'ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না'। আবার, মার্চের প্রথম দিকেই [৩রা মার্চ, ১৮৯০] প্রমদাদাসকে তিনি পওহারী বাবা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আগ্রহমান্দ্যের কথাও জানান। পওহারীর সাধনা তখনো অপূর্ণ,—এ রকম সন্দেহের কথাও তাঁর সে-চিঠিতে দেখা গেছে।

১৮৯০-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি গাজিপুর থেকে কলকাতায় বলরাম বসু মহাশয়কে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতেও পওহারী বাবার প্রসঙ্গ ছিল। এদিকে, ঐ ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি 'উত্তরকুরুবর্ষ'—অর্থাৎ তিব্বত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁর যে খুবই ভক্তি ছিল, সে বৃত্তান্তেরও উল্লেখ ছিল সেই চিঠিতে। প্রসঙ্গতঃ এদেশে তন্ত্রসাধনার ধারা সম্বন্ধে তিনি জানান যে, বৌদ্ধরাই আমাদের দেশে তন্ত্র-প্রবর্তনার জন্যে দায়ী। বামাচারের আতিশয্যে তারা যখন নির্বীর্য হয়ে পড়ে, তখন কুমারিল ভট্ট তাদের তাড়িয়ে দেন! তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে থাকে। বর্মা ও সিংহলের বৌদ্ধেরা কিন্তু তন্ত্র মানেন না, তিব্বতের বৌদ্ধেরা মানেন। তিনি লেখেন যে, বেদের কর্মবাদ অন্যান্য ধর্মের কর্মবাদের সঙ্গে মেলে। কর্মের উদ্দেশ্য—'বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধ করা'।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে এইসব মন্তব্য এবং তুলনার চিন্তা চলছিল তাঁর মনে। এই চিন্তার মধ্যেই তিনি বলে গেছেন,—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেবই প্রথম মানুষ…'The first man,'—যিনি এর বিপক্ষে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব আর শঙ্করাচার্য-এই দুই মহাত্মার ধর্মসাধনার সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি বলেন—উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের হৃদয় পান নি!—'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর'।

'সুত্তনিপাত' থেকে গণ্ডারসুত্তের অনুবাদ করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। সেই অনুবাদের প্রশংসা করে বিবেকানন্দ গীতার (৬।৮) 'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা

কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' অবস্থার দিকে তর্জনী-সংকেত করে গেছেন। ঐ বছর মার্চ মাসে গাজিপুর থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি যা লেখেন, তারই এক জায়গায় ছিল—'বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়'।

হঠযোগে ব্রতী বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটির গুরুত্ব কম নয়। ১৮৯০-এর কাছাকাছি সময়ে তাঁর এই মানসিক অবস্থা এবং এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের দিকটি দেখবার মতন। পওহারী বাবা ছিলেন রাজযোগী। রাজযোগীদের সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ কমতে থাকে এবং ঐ মার্চ মাসে তিনি এই কথা ভাবতে থাকেন যে, আর কোনো মিঞার কাছে যাবার দরকার নেই! এই সূত্রেই তিনি রামপ্রসাদের গানের কলি উল্লেখ করেন—

আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে
(ও মন), কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

এইসব কথার সঙ্গেই সে-পর্বের চিঠিপত্রে বারবার রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর নিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সর্বপ্রকারে সংশয়মুক্ত হয়ে তিনি লেখেন যে, রামকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা অবতার।

মার্চের শেষ দিকের (৩১-এ মার্চ ১৮৯০) এক চিঠিতে তিনি তাঁর তখনকার মানসিক অশান্তির কথা আবার জানান: 'আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন! কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি কে জানিবে?'

২৬-এ মে ১৮৯০ তারিখে, ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে প্রমদাদাসকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবার জানান—'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলুঁ' করিয়াছি'। তারপর নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে তিনি পুনরপি জানান—'আমার উপর তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি'।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিজের এই মত ছিল যে, পূর্ণসিদ্ধ ব্যক্তি ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু দেহাদি ভাবনার নিবৃত্তি যতক্ষণ না ঘটে, দেহীর দেহ-সংস্কার যতক্ষণ অন্তর্হিত না হয়, ততক্ষণ এক জায়গায় বসেই সাধনা করা দরকার। সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ লেখেন—'অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদির খরচ এবং বাটীভাড়া দিতেছেন।'

তাঁর এই চিঠিতেই সুরেশবাবুর মৃত্যুর খবর ছিল—'তিনি কল্যরাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন'। বলরাম বাবু তার অল্প আগেই মারা গেছেন। ১৫ই মার্চ ১৮৯০-এর চিঠিতে বলরামবাবুকে তিনি তাঁর কাছে আর চিঠি লিখতে নিষেধ করেন। বলরাম বাবুর এবং সুরেশবাবুর অসুস্থতার খবর পেয়ে, তিনি সেই চিঠিতে তাঁদের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দের পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর এই চিঠিখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রমদাদাসকে তিনি জানান যে, কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরে জমি কিনতে পাঁচ-সাত হাজার টাকা লাগবে,– কাশী প্রভৃতি দূর অঞ্চলে হয়তো চাঁদা উঠতে পারে। সুতরাং স্থায়ী একটি মঠ বা আশ্রমের জন্যে চাঁদা তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদিকে, বলরাম বাবুর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েই নরেন্দ্রনাথ গাজিপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সে-সময়ে মঠের খরচ চালাতে থাকেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯০-এর ৬ই জুলাই তারিখে স্বামী সারদানন্দকে লেখা তাঁর আর একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে, অতঃপর তিনি নিজে আলমোড়ায় যেতে উদ্যোগী হন—'সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা, গদাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে'।

তাঁর সাধনা এবং সিদ্ধির প্রকৃতি এক-কথায় বলবার নয়। পরমের অনুভূতি একদিকে,—কর্মযোগে জীবনের চরিতার্থতা সন্ধান অন্যদিকে—একযোগে এই দু'দিকের কথাই বিবেচ্য। সেজন্যে তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা এবং পরিব্রাজক-পর্বটুকু—দুই-ই বিশেষভাবে দেখা

দরকার। পরমহংসদেবের দেহত্যাগের সময় থেকে শুরু করে, পরবর্তী ছ-সাত বছরের নিরন্তর সংঘ-গঠনের মনোযোগ ও কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি তাঁর আধ্যাত্মিক সন্ধান ও স্বীকৃতির তথ্যগুলি সাজিয়ে দেখলে অন্তত বাইরের দিক থেকে তাঁর আত্মোপলব্ধির পথের সূত্রগুলি পর পর, যতোটা পাওয়া সম্ভব, তা পাওয়া যাবে।

এই বিচিত্র ভ্রমণের মধ্যেই ১৮৯১-এর এপ্রিলে তিনি আজমীর থেকে আবুপাহাড়ে যান। ১৮৯২-এর সেপ্টেম্বরে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে। ২০-এ সেপ্টেম্বর খেতড়ির পণ্ডিত শঙ্করলালকে তিনি এক চিঠিতে জানান যে, ভারতবর্ষীয়দের বিদেশ ভ্রমণ দরকার, মানবসেবার আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। বোধ হয়, এই সময়েই বোম্বাই থেকে পুনার পথে পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে তিনি আট-দশ দিন ছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাড়গাঁও থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে তাঁর দক্ষিণ-ভারতের পাঞ্জেম প্রভৃতি গ্রামে ভ্রমণের উল্লেখ আছে। এই চিঠিতে তিনি 'সচ্চিদানন্দ' নাম সই করেন। আমেরিকা-যাত্রার কিছু আগে থেকে আমেরিকা-যাত্রা পর্যন্ত এই নামেই তিনি চিঠি সই করিতেন।

২১এ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের খার্তাবাদে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে লেখা আলাসিঙ্গার নামে তাঁর একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে তাঁর আমেরিকা-যাত্রার আয়োজনে কিছু যে দেরি হয়ে গেছে,—অতিরিক্ত গরমের জন্যে তিনি যে রাজপুতানায় ফিরতে পারবেন না, ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যক্তিগত খবর ছিল। তবে ২৭এ এপ্রিল, তাঁকে রাজপুতানায় খেতড়িতে বিদ্যমান দেখা গেছে। সেখান থেকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন।

বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি বলতে যা বোঝায়, একদিকে সে তাঁর ব্যক্তিগত কথা, অন্যদিকে মানবজাতিগত; একদিকে তাঁর সারা জীবনের তপস্যা, অন্যদিকে সে-তপস্যার ফল লাভের জন্যে মানব-জগতের প্রস্তুতি বা সামর্থ্য। শিকাগো-পর্বের সূচনা অবধি তাঁর জীবন মোটামুটি এই ভাবেই এগিয়েছে। তারপর তাঁর জগদ্ব্যাপী খ্যাতির অধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বিবেকানন্দ হয়েছেন।

শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলন থেকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ধরলে আপত্তি হবার কথা নয়। ১৮৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজে তিনি এক ভাষণে তাঁর পশ্চিম-যাত্রার সংকল্প প্রকাশ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলে গেছেন যে, ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূর করবার তাগিদেই বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রার প্রস্তাবে রাজি হন। স্বামীজীর সেদিনকার সহযোগী সন্ন্যাসীরা সে-অভিপ্রায়ের মধ্যে জগদ্বরেণ্য সাধক গৌতম বুদ্ধের অনুভূতির প্রতিধ্বনি অনুভব করেন।

১৮৯৩-এর ৩১এ মে বোম্বাই ত্যাগ করে সিংহল, পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যাণ্টন, নাগাসাকি হয়ে—য়োকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও দেখে,—য়োকোহামা থেকে ভেঙ্কুবরে,—এবং সেখান থেকে ট্রেনে তিনি শিকাগোতে গিয়ে পৌছোন। সে-সব প্রসঙ্গ আজ সকলেরই সুপরিচিত। প্রথম আমেরিকায় গিয়ে তাঁর দুর্দশা আর হায়রানির অন্ত ছিল না। ম্যাসাচুসেট্সের এক মহিলার আনুকুল্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারপর, ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্ম-মহাসম্মেলনের সূচনা। সে সভায় সারা জগৎ যেন প্রথম বিবেকানন্দকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে! খ্রীষ্টানদের মধ্যে গ্রীক, রুশ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি—জাপানের শিণ্টো, কনফুসিয়ান চীনা,—সিংহলের ধর্মপাল; কলকাতার প্রতাপ মজুমদার,—জৈন,—ইথিওপীয়,—অনেকেই সে-সভার সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দই সে-সভার প্রধান সংবাদ। অ্যানি বেসাণ্ট, কবি হ্যারিয়েট মনরো প্রভৃতি অসংখ্য ভাবুক, কবি, সাংবাদিকের কাছ থেকে সে-বৃত্তান্ত জানা গেছে।

'যত মত তত পথ'—রামকৃষ্ণের এই সরল সদুক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের যে নিগূঢ় আদর্শটি সূচিত, জগতের ধার্মিক সভায় তিনি সেই আদর্শের কথাই তুলে ধরেন। শিকাগোর সেই পরমাশ্চর্য বিজয়-গৌরবের কথা-প্রসঙ্গেই রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন,—সেই বিজয়-মহিমার শুভলগ্নেই স্বামিজী অশ্রুবিসর্জন করেছেন, কারণ তিনি তখন একথা স্পষ্টই অনুভব করেন যে, স্বাধীনভাবে, নির্জনে ভগবানের নৈকট্য-ভোগের দিন তাঁর ইহজীবনে এবারের মতন শেষ হোলো! তখন একদিকে অন্তরে প্রত্যাদেশ—'ত্যাগ করো, ঈশ্বরে নিমগ্ন হও,'—অন্যদিকে জগৎ-সভায় স্বদেশের প্রতিষ্ঠা অর্জনের ব্যাকুলতা! বোধ

হয়, তাঁর সাধনার প্রতি পর্বে, প্রতিদিন তিনি মনের এই দোটানা অনুভব করেছেন। তবু, অদৃষ্ট তাঁকে বহির্জগতের কর্মত্যাগে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করতে পারে নি। ভণ্ড খৃষ্টানির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর নানা আলোচনায় ধর্মের গভীর সত্যানুসন্ধিৎসার উপযোগিতাই তিনি বার বার বলে গেছেন। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে,—ইউরোপের নানা দেশে ভারতবর্ষের এই সন্ন্যাসীর এই সাধনা, আর এই স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৫৯-এর জুন-জুলাইয়ের থাউজ্যাণ্ড-আইল্যাণ্ডস্ পার্ক-এ কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে দিনের পর দিন তিনি বাইব্‌ল পাঠ দিয়ে তাঁর ধর্মালোচনা শুরু করেছেন। ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বরে—১৮৯৬-এর এপ্রিল থেকে জুলাই,—আবার ঐ বছরেই অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত, মোট তিনবার তিনি ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন। ম্যাক্স্‌মুলার, হেল্‌মোহলজ, পিয়ের হিয়াসান্থ, হিরাম ম্যাক্‌সিম, প্যাট্রিক গেড্ডেস, পল ডয়সেন, উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রভৃতি নানা মনীষীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি।

১৮৯৬-এর ২৮-এ মে ম্যাক্সমুলারের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। ম্যাক্সমুলারের ঋষিজীবন তাঁকে অভিভূত করে। সেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই টলস্টয়ের বন্ধু আই নাঝিভিন '*Voice of the people*' নামে এক সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে বিবেকানন্দের '***Hymn of the people***' এবং '***God and man***' লেখাদুটি পড়ে টলস্টয় মুগ্ধ হন। উইলিয়ম জেম্‌স্ যে তাঁর 'ধর্মসাধনার অভিজ্ঞতা'-সম্পর্কিত বইখানিতে স্বামিজীর সাধনার দৃষ্টান্ত স্মরণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

নিবেদিতার সঙ্গে এই পর্বেই তাঁর প্রথম সংযোগ ঘটে। ১৮৯৫এ, ৯৬এ— ইংলণ্ডে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনেছিলেন তিনি। ১৮৯৮ এর শুরুতেই তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ঐ বছর গ্রীষ্মকালে ম্যাসাচুসেট্‌সের শ্রীযুক্তা ওলিবুল এবং স্বামিজীর অন্যান্য ভক্ত শিষ্য এবং অনুরাগী কয়েকজনের সঙ্গে তিনিও আলমোড়ায় কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন। স্বামিজী সঙ্গে ছিলেন। আলমোড়ায় সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করা হয়। বাংলা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চল পরিক্রমার এই বৃত্তান্ত আছে নিবেদিতার নিজের রচনায়। সে-পর্বে নবীন সন্ন্যাসী স্বামী স্বরূপানন্দের কাছে ধ্যানের শিক্ষা পেয়েছেন তিনি। তাছাড়া তাঁর বাংলা ভাষা এবং হিন্দুধর্মের শিক্ষাও অনেকটা তাঁরই কাছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোলকোণ্ডা জাহাজে তিনি দ্বিতীয়বার পশ্চিম যাত্রা করেন। সে-যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে তিনি এই ভ্রমণের যে সব বিবরণ পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে এক জায়গায় তিনি লেখেন: 'এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা!...স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?'

তাঁর প্রবাস-জীবনের এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। ১৩৪০এর শ্রাবণে লেখা 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, আধুনিক যুগ মানেই চিত্তের স্বষ্টি-বৈচিত্র্যের যুগ—এ-যুগে ইংরেজের, তথা য়ুরোপের প্রসাদে আমরা পেয়েছি 'ন্যায়াদর্শের সর্বভূমিনতা' এবং 'জ্ঞানের বিশ্বরূপ'। ভারতবর্ষের ইংরেজ-আমলের কথা তুলে বিবেকানন্দও তাঁর এই 'পরিব্রাজক' পত্রাবলীর এই অংশে সংরক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের সম্বোধন করে দেশের আত্মশাসনের ভার দেশের নবীন নবজাতকদের হাতে,—সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিতে বলেন। তাঁর সে-সব কথা স্মরণযোগ্য: 'এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, বাজার থেকে।' লোকসাধারণের এই অধিকার প্রচারে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। সমাজ-চিন্তায় তাঁর প্রগতিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রেরই সন্নিহিত।

এশিয়া, আফ্রিকা পেরিয়ে,—য়ুরোপের প্রবেশ-পথে পৌঁছে, ভূমধ্যসাগর থেকে আবার তিনি য়ুরোপের কথা উল্লেখ করেন: 'নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহুশতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। যে ধর্ম, যে বিদ্যা, যে সভ্যতা, যে মহাবীর্য আজ ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি।' এই ভ্রমণেই আরো কিছুদূর এগিয়ে তিনি

লেখেন: 'গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না'।

এসব বিবরণের তালিকা দীর্ঘ। সব ঘটনা, সব ভ্রমণ, সব ব্যক্তি-পরিচয় বা অধ্যয়ন-পরিচিতির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কতটুকুই বা জানা যায়! ১৯০২এ তাঁর মৃত্যু অবধি এই রকম অসংখ্য ঘটনার তীব্র, বেগবান স্রোত বয়ে গেছে।

সেবার ইউরোপ-ভ্রমণের পথে তাঁর নানা অঞ্চলের নানা সঙ্গীর মধ্যে ছিলেন ফরাসী লেখক জুল বোয়া, ফরাসী গায়িকা শ্রীমতী কাল্ভে, প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড। কথায়-কথায় এঁদেরই প্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁর মাতৃভূমির কথা ভেবেছেন। বাঙালী মেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সেকালে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতোটুকুই বা পেতে পারতেন? সেই দুঃখের কথা ভেবে তিনি লেখেন: 'বাঙালীর মেয়েরা বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও উপায়াভাবে বিফল; বাংলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল-নাটক! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা দু-চার জনের জন্য মাত্র।' রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' বইখানির নানা মন্তব্যের স্মৃতি জেগে ওঠে বিবেকানন্দের এই সব মতামত পড়তে পড়তে। 'বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' প্রবন্ধে ['উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৬৮] ডক্টর কালিদাস নাগ, 'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত' প্রবন্ধে ['উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৬৪] স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন,—'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' বইখানিতে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ বিবেকানন্দের রবীন্দ্র-গীতি চর্চার উল্লেখ করেছেন। 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি,'—'জগতের পুরোহিত তুমি,'—'শুভদিনে এসেছ দোঁহে'

ইত্যাদি গান তিনি নিজে গেয়েছেন বলে শোনা যায়। কাশীতে তিনি 'এ কী এ সুন্দর শোভা কী মুখ হেরি এ' গানটি গেয়েছিলেন।

য়ুরোপের কাব্যে-সাহিত্যে তিনি বেদান্তের ব্যাপক প্রভাব অনুভব করেন। সে-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য : 'বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে—কাব্যে এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রেই দেখছি বেদান্তী ; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায়—যেমন হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ; কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে।'

বিদেশে—পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচিত্র জৌলুষের মধ্যে যখন তাঁর দিন কেটেছে, তখনো ভারতের নিজস্ব গৌরবের কথাই তিনি বার বার স্মরণ করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির এক জায়গায় লিখেছেন যে, ভারতবাসীর চোখে পাশ্চাত্য জাতি 'অসুর' ; আর সেকালে পশ্চিমের চোখে ভারতবাসী ছিল 'কালো দাস'। কিন্তু, তাঁর মতে, এই দুই দৃষ্টির কোনটিই নির্ভুল নয়। ভারতবর্ষের এবং য়ুরোপের,—উভয়েরই জাতিগত ভিত্তিতে বিশেষ এক-একরকম জাতীয় ভাবের কথা স্বীকার্য। বিদেশীকে আহ্বান করে তিনি বলেন : 'ভারতেরও বল আছে, মান আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।' এই সূত্রেই তিনি আরও বলেন : 'এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশি বাজাচ্ছেন'। বলছেন—আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার' প্রাধান্য,—পাশ্চাত্যে 'ধর্মের' ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন—যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখের প্রবৃত্তি দেয়,—সুখের জন্যেই যা মানুষকে নানাভাবে খাটাচ্ছে, তারই নাম 'ধর্ম'। ধর্ম ক্রিয়ামূলক। আর 'মোক্ষ' মানুষকে এই কথাই শোনায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকের সুখও গোলামি। প্রকৃতির টান জড়ের দিকে নামায়। মানুষকে প্রকৃতির বাইরে যেতে হবে। কিন্তু ধর্ম বাদ দিয়ে মোক্ষ চাওয়াটাও পাগলামি। বৌদ্ধ আমলেই মোক্ষের দিকে আগ্রহের প্রাধান্য দেখা দেয়, ভারতবর্ষে ধর্ম-মোক্ষের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—এই হোলো মোক্ষমার্গের কাম্য, সত্ত্বপ্রাধান্যের গুণ ; আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' হোলো ধর্মলাভের উপায়, রজঃপ্রাধান্যের নির্দেশ।

কিন্তু ভারতবর্ষ তামসিক নিষ্ক্রিয়তায় ডুবেছে,—অতএব—'এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ',—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।

স্বামিজীর সাধনা ও সিদ্ধির যে-দিকটি তাঁর ইহজীবনের জন্মভূমি ও স্বদেশের দিকে প্রসারিত, সেদিকে তাঁর এই বাণীই সর্বোচ্চ। তিনি বলেছেন: 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড'; 'ইংরেজচরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান—যথাভাগ ন্যায়বিভাগ ইংরেজের আসল কথা'; 'হিন্দু বলেছেন কি যে রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে একমত।'

ভারত-ঐতিহ্য বা ভারত-ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন যে তুলনারহিত অভিনব ব্যাপার, সে-কথাও তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধমালার এক জায়গায় বলা হয়েছে: "এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারত-বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গতকাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।" এই বইখানির 'শূদ্র-জাগরণ' প্রবন্ধে তাঁর স্বদেশ ও স্বকাল সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যেই দেখা যায়: 'ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব'। সমস্ত পৃথিবীতে শূদ্র-জাগরণ যে আসন্ন, সে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল এই প্রবন্ধটিতে। তাতে চীন, জাপান, ভারতের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আচারের অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তির নিন্দা করে তিনি বলেন: 'পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে'।

তাঁর নানা কর্ম, নানা ভ্রমণ, বিভিন্ন সংযোগের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের এই সাধনার কথাই বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ১৮৯৪এ আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে তিনি এক চিঠিতে যা জানান, তার বঙ্গানুবাদ এই: 'আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য বা সভা সমিতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের

কার্যক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য সমাদৃত হওয়ার এইটুকু মূল্য যে উহাতে ভারত জাগিবে ; এই পর্যন্ত। মাদ্রাজ ও কলিকাতা—এক্ষণে দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে'। এই চিঠিরই পরের দিকের আরো একটু অনুবাদ দেখা যেতে পারে—'আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা'। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজচিন্তায় এই আধ্যাত্মিকতার অত্যাবশ্যক ভিত্তি রক্ষার কথাই পরে আবার শোনা গেছে। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক,—এবং লৌকিক বা ব্যবহারিক,—দুই সত্যই স্বীকার করে গেছেন। বিবেকানন্দের এই চিঠির শেষ দিকে 'পুনশ্চ' অংশে বলা হয় : 'বর্তমান হিন্দুসমাজ কেবল আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন মানুষের জন্য গঠিত এবং অন্য সকলকেই নির্দয়ভাবে পিষিয়া ফেলে। কেন ? যাহারা সাংসারিক অসার বিষয় যথা রূপরসাদি—একটু আধটু সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা কোথা যাইবে ? তোমাদের ধর্ম যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম—সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজের উচিত তদ্রূপ উচ্চ-নীচ ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা'। শিকাগো থেকে ১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৪ হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে তিনি তাঁর বিখ্যাত শিকাগো-ভাষণ সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর গুণগ্রাহিতার কথা জানান এবং সে-চিঠি প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। শেষাংশের বঙ্গানুবাদে দেখা যায় : 'আমি প্রভুর কার্য করিয়া যাইতেছি এবং তিনি যেথায় লইয়া যাইবেন তথায়ই যাইব'।

লণ্ডনে গুডউইনের সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজ-অধিকারের সূচনা-পর্ব সম্বন্ধে তাঁর অনেকদিন অনেক আলোচনা হয়েছে। সেই সব আলাপের মধ্যে স্বামিজী বলেছিলেন : 'ছাখ্, এই ভারতবর্ষটিকে hypnotise করে ফেলেছে তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর ব'সে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnotism চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোদের চেপটে মেরে ফেলবে—will squeeze you like lemon'। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ-কথা লিখে গেছেন। মহেন্দ্রনাথই তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সন্ন্যাসীর

পক্ষে স্বদেশানুরাগ কি সম্ভব ?—সকল দেশের কল্যাণচিন্তাই তো সন্ন্যাসীর আদর্শ,—সে-ক্ষেত্রে পৃথকভাবে স্বদেশানুরাগের অস্তিত্ব কি সম্ভব ? তার উত্তরে স্বামিজী বলেন : 'যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে ?'

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তার 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' লিখে গেছেন যে, ১৮৯৭এ আমেরিকা থেকে ফেরবার পরেই একদিন স্বামিজী তাঁর ভক্তদের এক সভায় বলেন : 'নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে যে সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারেনা'। তাই তাঁর সংঘপ্রতিষ্ঠা। তাঁর তিরোধানের মাস ছয়েক আগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে তিনি একদিন বলেছিলেন : 'ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি, তাহার জন্য ব্যস্ত আছি···। আমার অবসর নাই'।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন : 'জগতে যাহা অলৌকিক রহস্য নামে পরিচিত, সেই জিনিসটিকে ভারতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করাকে তিনি এরূপ উৎকট ভীতির চক্ষে দেখিতেন যে, ঐ ভয় তাঁহার [এই] অজ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ অপেক্ষা বড় কম ছিল না'। আবার, স্বামিজীর শেষ দিনগুলির কথাপ্রসঙ্গে তিনি যা লিখে গেছেন, তার বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—'১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্বামিজী যে সকল বন্ধুর সহিত মিশরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সহসা বিদায় লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন।···পরবর্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গমন করিলেন এবং অনেক দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটি তীর্থে স্নান করিতে গেলেন।···১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন করিলেন।···১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এই দুই মাস'—তিনি বুদ্ধগয়া ও বারাণসী তীর্থ ভ্রমণ করেন।

মঠ সমাপ্ত হলে, সংঘের কাজ শুরু করে দিয়ে, তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সাধনা জগদ্ধিতায়। তাঁর সেই কর্মই তাঁর সিদ্ধির সর্বাধিক দৃষ্টিগোচর দিক। আর, ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরপ্রাপ্তির দিকটি তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্য দিক। সে-বিষয়ে কথা বাড়াবার অধিকার বড়োই সীমিত। বর্তমান লেখকের পক্ষে সে-প্রসঙ্গ অনধিকারের ক্ষেত্র।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করতে আসিয়াছে—পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই'। আমাদের উনিশ-শতকের ভাব আর কর্মের বৃহৎ পরিব্যাপ্তিরও একটি কেন্দ্র ছিল। সেই কেন্দ্রের কথাই বিবেচ্য।

ঐতিহ্য-স্বীকৃতি আর নতুনত্বের দিকে ঝোঁক, দুইই সেই কেন্দ্রের লক্ষণ,—দুইই তাতে আশ্রিত। ব্যক্তিজীবন আর জাতি-জীবন দুইই তার অন্তর্ভুক্ত। রামমোহনের ছিল ব্যক্তিগত বিদ্রোহ; 'তিনি পুরামাত্রায় অ্যারিষ্টোক্র্যাট'—স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে গেছেন—'তথাপি তাঁহার সেই 'আইডিয়া' তদানীন্তন জড়তাগ্রস্ত সমাজের মনে যে প্রথম ধাক্কা দিয়াছিল—পরবর্তীকালের বহু মনীষী তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।'

রামমোহনের এই 'বিদ্রোহ' এবং তাঁর এই 'আইডিয়া'-র ব্যাখ্যা মোহিতলালের 'বাংলার নবযুগ' বইখানির প্রথম প্রবন্ধ 'রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন' নামে আলোচনার মধ্যেই সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। রামমোহনের ব্যক্তিগত বিদ্রোহের সঙ্গে ফরাসী-বিদ্রোহের সমধর্মিতার ইঙ্গিত ছিল সে-মন্তব্যে। মোহিতলালের নিজের ভাষায়—'প্রায় সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধিকারবাদ—রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছিল,—রামমোহনের এই চেষ্টার মূলেও তেমনই এক ভিন্নতর বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিবার সেই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইহাই সে-যুগের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা।'

রামমোহনের পূর্বোক্ত 'আইডিয়া, এই ছিল যে, তিনি অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-বাদের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা থেকে জাতির মন মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশে ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসে যে শাক্ত-সাধকদের ধারা দেখা যায়, রামমোহনের সঙ্গে সেই ধারার এক রকম অন্বয় অনুভব করে প্রবন্ধকার লিখে গেছেন —'আমাদের দেশে শাক্ত-সাধকগণ সমাজের বাহিরে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের শক্তিসাধনা ব্যক্তিগতভাবে করিতেন, রামমোহন সমাজের ভিতরেই ব্যষ্টি সমষ্টিগতভাবে, আধিভৌতিক ঋদ্ধিলাভের জন্য,

সেইরূপ সাধনার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং বলিষ্ঠ মেধা ও তীক্ষ্ম বৈষয়িক বুদ্ধি সহকারে সেই মত ঘোষণা করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিন্তু সে বিদ্রোহের ফল কী? মোহিতলালের নিজের মন্তব্য—'নবযুগের এই নূতন মুক্তিতন্ত্র—শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদ—সেকালের পণ্ডিতসমাজকেই আঘাত করিয়াছিল, জাতির চৈতন্যে সাড়া জাগে নাই, এই নূতন তন্ত্র সমাজে কেবল একটা বিরোধের বীজ বপন করিয়াছিল। ইহার কারণ রামমোহন ছিলেন নিজেরই মুখপাত্র, তাঁহার বিদ্রোহ ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত—তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় অ্যারিষ্টোক্র্যাট।

উনিশ-শতকের বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে য়ুরোপের সংস্পর্শে এই যে নতুন চাঞ্চল্য দেখা দেয়, রামমোহনের ব্যক্তিত্বই সে-ধারায় প্রথম চোখে পড়বার মতন ঘটনা। বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাভাষার ব্যাপক চর্চা, ধর্মের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার ইত্যাদি অন্যান্য ঘটনা সেই রামমোহনের যুগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে, বিশেষ ব্যক্তি-অভ্যুদয়ের উল্লেখ করতে গেলে রামমোহনের প্রসঙ্গই এ-পর্যালোচনার আদি-প্রসঙ্গ বলতে হবে। রামমোহনের পরে, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেক ছিলেন। মোহিতলাল বলেছেন—'বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ রামমোহনের তুলনায় বহুগুণে গভীর ও ব্যাপক। কারণ, বিদ্যাসাগর 'সাক্ষাৎ জীবনের ক্ষেত্রে সেবা ও প্রেমের শক্তিতে' তাঁর বিদ্রোহ 'সাকার' করে তুলেছিলেন। সে যাই হোক্, রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত,—অর্থাৎ শতাব্দীর আদি-প্রান্ত থেকে শেষ অবধি, বাংলাদেশে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সাধনার পথে একে একে কতো যে স্মরণীয় মানুষের অভ্যুদয় ঘটেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান-ধর্ম-সমাজনীতি ইত্যাদির সংস্পর্শে, আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডের গভীরে হঠাৎ যেন নতুন উদ্দীপনার স্রোত দেখা দেয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ, মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কথা ভাবতে গেল এঁদের এবং সমকালীন অন্যান্য গুণিজনের মত ও পথের বৈচিত্র্যের দিকটি স্বতঃই মনে আসে। রামমোহন আর বিদ্যাসাগর দুজনেই ছিলেন জ্ঞান-কর্মযোগী; কিন্তু এঁদের আয়ুষ্কালে, কর্মজীবনে, ধর্মমতে,—কোন-দিকেই পুরোপুরি মিল ছিলনা; বরং এঁদের জীবনের বিশেষ পর্বে পরস্পরের

মধ্যে মতভেদ বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। শোনা যায়, বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের মধ্যেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বেশ মতানৈক্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধও কম হয় নি। উনিশ-শতকের প্রথম প্রতিভাধর কবি মধুসূদনকেও তাঁর সমকালীন সাহিত্য-সাধকদের কারও-কারও কাছে তীব্র সমালোচনা শুনতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁকেও অনেক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের পথে চলতে হয়েছে। আবার কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হয়েও রামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তিযোগে মিলেছিলেন।

মতে এবং পথে এইসব সাধকের জীবন যে বহু বিচিত্র প্রভেদের উদাহরণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর আর রামকৃষ্ণ, উভয়েই ছিলেন গভীরভাবে সেবাধর্মে বিশ্বাসী। তবু, এঁদেরও দৃষ্টিভেদ প্রসিদ্ধ। এইসব বৈসাদৃশ্যের ধারা লক্ষ্য করেও আমাদের উনিশ-শতকের যে সাধারণ মনোধর্মের দিকটি মানতেই হয়, তাকে বলা যায় জ্ঞানে আগ্রহী ঐকান্তিক কর্মবাদ। সে-কর্মের আশ্রয় ছিল অকুণ্ঠ আধ্যাত্মিকতা। আত্মস্থ রামকৃষ্ণের মধ্যেও যেমন, নিত্যতৃষ্ণার্ত ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যেও তেমনি, সেই আধ্যাত্মিকতাই কাজ করেছে। আধ্যাত্মিকতা আর কর্মনিষ্ঠা,—একযোগে এই দুয়ের অভিব্যক্তিই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উনিশ-শতকের বিশেষত্ব হিসেবে গণ্য। বিজ্ঞান-চেতনা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি অন্যান্য দিক ছিল জাতিমানসের তৎকালীন এই মূলে আশ্রিত।

প্যারীচরণ সরকারের মতন একজন শিক্ষকের কথা ভাবতে গেলেও এই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণই সর্বাধিক চোখে পড়ে। কৃষ্ণদাস পাল তাঁকে বলে গেছেন—'The Prince of Indian Teachers'। রামমোহনের যখন প্রবল খ্যাতি-প্রতিপত্তি, প্যারীচরণের জন্ম হয় সেই সময়ে, ১৮২৲-এর ২৩এ জানুয়ারি। তাঁর বাল্য-কৈশোর উদ্‌যাপিত হয় ডেভিড হেয়ারের সান্নিধ্যে। রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাধবচন্দ্র রুদ্র ইত্যাদি ছিলেন তাঁর সহাধ্যায়ী। পরিণত জীবনে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে এবং 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনার কাজে প্যারীচরণ খুবই খ্যাতিমান হন। আবার, পরলোকতত্ত্বেও তাঁর আগ্রহ ছিল। শরীর-বিজ্ঞানের চর্চাতেও তাঁর কিছুদিন কেটেছিল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্রও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে গণ্য। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী হিন্দু। আর, সে-যুগে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান বা অন্য যে-

কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের কথাই উঠুক না কেন, সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্মরণীয় বাঙালী, তথা ভারতবাসীই ছিলেন লোককল্যাণে বিশ্বাসী। হিন্দু-মতবাদের মধ্যে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে আচারগত পার্থক্য যতোই থাক, মূলত হিন্দু-চিন্তার ভিত্তিই হল সর্ব-বৈচিত্র্যের গভীর একাত্মতায় আস্থা।

বিচিত্র বিভেদের গভীরে এই ঐক্যবোধে আস্থাই আমাদের সত্যিকার আশ্রয়। এ কথা শাস্ত্রের কথা। 'যত মত, তত পথ'—এ কথা রামকৃষ্ণের বিশ্বাস তো বটেই; এই বিশ্বাসের জোরেই নানা বাধা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ সময়ধারায় আমরা বেঁচে আছি। গীতার বাণী মনে পড়ে—যে আমাকে যেভাবে পূজা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। ভগবানের কাছে মানুষের এই ভরসাটুকু আমাদের সে-যুগের প্রধান অবলম্বনের মধ্যে গণ্য। মানব-সমাজে এ বিশ্বাস যেখানে নেই, সেখানেই হ্রস্ব-দৃষ্টির উৎপাত দেখা দেয়।

মানুষের চৈতন্যের সক্রিয়তা বিশ্লেষণ করে ধর্মপথের সাধকরা জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি,—এই ত্রি-পথের মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ একরকম প্রভেদ মেনেছেন বটে। কিন্তু যথা-জ্ঞান, যথা বাসনা এবং যথা-কর্ম,—এই তিনের সমুচিত অভিব্যক্তি আলাদা আলাদা পাত্রে নয়, বোধ হয় একই শুদ্ধ আধারে সম্ভব। আমাদের উনিশ-শতকের জাতীয় ভাবজীবনে প্রথম দিকে সংশয়, অবিশ্বাস ইত্যাদি ভাঙনের ঘাত-প্রতিঘাত যাই ঘটে থাকুক, শতাব্দীর গতিপথে ক্রমশ এই আধারশুদ্ধির ব্যাপক প্রবণতাই ব্যক্ত হতে থাকে।

ধর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক জায়গায় বলেছেন যে, ধর্ম তো কোনোরকম আচার-রক্ষা মাত্র নয়, ধর্ম মানুষের অনন্ত তৃষ্ণার সঙ্গেই জড়িত।[২] ভারতবর্ষে এ-কথা বার বার বলা

২। The effort of religion is to enable man to realise the divine in him not merely as a formula or a proposition, but as the central fact of his being, by growing into oneness with it. The way to reach this religious experience cannot be prescribed. The soul of man whose nature is infinite has unlimited possibilities in it. The God whom it seeks is equally infinite and wide. The reactions of an infinite soul to an infinite environment cannot be reduced to limited forms. The Hindu thinkers recognise that the exhaustless variety of life cannot be confined to fixed 'moulds.'

—The Heart of Hinduism : The Heart of Hindusthan 'তৃতীয় সংস্করণ'
(C. A. Natesan & Co.); পৃষ্ঠা ৮-৯ দ্রষ্টব্য

হয়েছে। উনিশ-শতকেও এই কথাই বাংলার নানা মনীষীর জীবন-সাধনায় সত্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেকের মধ্যে প্যারীচরণ সরকারও অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তি। ধর্মাচরণ বলতে যা বোঝায়, সেদিক থেকে তিনি ছিলেন লোকহিত সাধক। মানুষের দুঃখ দূর করবার ব্রতই ছিল উনিশ-শতকের বাঙালীর প্রধান ব্রত।

পশ্চিমের ভাব-সাধনার সংস্পর্শ যে সেকালে আমাদের মননশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নানাভাবে আকর্ষণ করেছিল, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একসময়ে বলেন—'বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেবদেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জল-মাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ-দেবী, বাংলাদেশ। নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্তর থেকে।··বন্দেমাতরম্ অহিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নাস্তিকতার সুরা। এই মন্ত্রে কঁৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজ-সেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে'।[৩]

'ভক্তিমার্গী নাস্তিকতা' কথাটি উনিশ-শতকের বাংলার বিদ্রোহ-ভাবনার আংশিক সূচনা বটে, কিন্তু সত্যিই চমৎকার কথা। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন না। তবে নাস্তিক্য-আস্তিক্য, দুয়ের মধ্যেই বোধ হয় সেকেলে কতকটা নাস্তিক্যের ঝাঁজ ছিল। স্কুল-কলেজের হাওয়া চাই তর্কের হাওয়া। সে-হাওয়া সেকালের মনে ধরে গিয়েছিল। রামমোহনও নাস্তিক ছিলেন না। আবার কেশব সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদিও গভীর ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামও এই ধারাতেই স্মরণীয়। তাঁর পিতার নাম আনন্দকিশোর, জননীর নাম স্বর্ণময়ী। ১২৪৮ সালের ১৯এ শ্রাবণ, সোমবার (২রা আগষ্ট, ১৮৪১) নদীয়া জেলার শিকারপুরের সন্নিহিত দহকুল গ্রামে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

আনন্দকিশোরের জাঠতুতো ভাই গোপীমাধব গোস্বামী মৃত্যুর সময়ে আনন্দকিশোরকে বলেন যে, তাঁর একটি সন্তানকে তিনি যেন গোপীমাধবের

৩। বিনয় সরকারের বৈঠকে [দ্বিতীয় ভাগ] ১৯৪৫ ; পৃষ্ঠা ৬৪ দ্রষ্টব্য।

কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের কথাই উঠুক না কেন, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেই ছিলেন লোককল্যাণে বিশ্বাসী। সাধারণভাবে একথাও স্বীকার্য যে, হিন্দু-মতবাদের মধ্যে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে আচারগত পার্থক্য যতোই থাক, মূলত হিন্দু-চিন্তার ভিত্তিই হল সর্ব-বৈচিত্র্যের গভীর একাত্মতায় আস্থা। ধর্মপথের সাধকরা জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি,—এই ত্রি-পথের বিভাগে সূচিত বিশেষ বিশেষ প্রভেদ মেনেছেন বটে, কিন্তু, যথা-জ্ঞান, যথা-বাসনা এবং যথা-কর্ম,—এই তিনের সমুচিত অভিব্যক্তি আলাদা আলাদা পাত্রে নয়, বোধ হয় একই শুদ্ধ আধারে সম্ভব। আমাদের উনিশ-শতকের জাতীয় ভাবজীবনে প্রথম দিকে সংশয়, অবিশ্বাস ইত্যাদি ভাঙনের ঘাত-প্রতিঘাত যাই ঘটে থাকুক, শতাব্দীর গতিপথে ক্রমশ এই আধারশুদ্ধির ব্যাপক প্রবণতাই ব্যক্ত হ'তে থাকে।

ধর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক জায়গায় বলেছেন যে, ধর্ম তো কোনোরকম আচার-রক্ষা মাত্র নয়, ধর্ম মানুষের অনন্ত তৃষ্ণার সঙ্গেই জড়িত।[২] ভারতবর্ষে এ-কথা বার বার বলা হয়েছে। উনিশ-শতকেও বাংলার নানা মনীষীর জীবন-সাধনায় এই কথাই সত্য হয়ে উঠেছিল। এইসব মনীষীর কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদিক দিয়ে এঁদের মধ্যে সমধর্মিতা ছিল। ব্যাপক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ দেশের যে অবসাদমুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অপেক্ষাকৃত সীমিত ক্ষেত্রে প্যারীচরণ সরকারের মতন একজন শিক্ষকও ছিলেন সেই অবসাদমুক্তিরই উদাহরণ। যথার্থ জ্ঞানযোগে দেশের মানুষের দুঃখ দূর করবার ব্রতই ছিল উনিশ-শতকের

২। The effort of religion is to enable man to realise the divine in him not merely as a formula or a proposition, but as the central fact of his being, by growing into oneness with it. The way to reach this religious experience cannot be prescribed. The soul of man whose naturo is infinite has unlimited possibilities in it. The God whom it seeks is equally infinite and wide. The reactions of an infinite soul to an infinite environment cannot be reduced to limited forms. The Hindu thinkers recognise that the exhaustless variety of life cannot be confined to fixed 'moulds'.

—The Heart of Hinduism : The Heart of Hindusthan, তৃতীয় সংস্করণ (C. A. Natesan & Co.) ; পৃষ্ঠা ৮০ দ্রষ্টব্য।

বাঙালীর প্রধান ব্রত। মতামতের সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও এই অন্বয়-দৃষ্টিতে কোনো পক্ষেরই আপত্তি ছিল না।

১৮৬৩র ১২ই জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের তিরোধান তার তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণসঞ্চারক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও [১৮০৯-৩১] লোকান্তরিত হন রামমোহনেরও বছর দুয়েক আগে। ডেভিড হেয়ার [১৭৭৫-১৮৪১] দেহরক্ষা করেন নরেন্দ্রনাথের জন্মের বাইশ বছর আগে। বিদ্যাসাগর তখন একুশ বছরের নবযুবক। শিক্ষায়, আচরণে, ব্যক্তিত্বে এঁদের মধ্যে যতো পার্থক্যই থাক্, যুক্তি-তর্কের পথ ধ'রে দেশপ্রেম, তথা বিশ্বপ্রীতির দিকে এগিয়ে যাবার প্রশস্ত কর্মপথ খুলে দিয়ে গেছেন এঁরা। উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর আত্মপ্রকাশের এই রাজপথেই ষাটের দশকের জাতক নরেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন। ইতিমধ্যে বিদেশী ভাবের সঙ্গে দেশী ভাবের বিরোধ ঘটা যতোই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যাক্, এইসব ভাবনেতার উপস্থিতির ফলে প্রথা, সংস্কার, ঐতিহ্য আর নতুন যুগাদর্শের প্রেরণা যে অনিবার্য এক অন্বয়ের অভিমুখে এগিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

নরেন্দ্রনাথের জন্মের আগেই প্রথমে রামমোহনের পর্ব, তারপর ইয়ং বেঙ্গল-পর্ব অতিক্রান্ত বটে, কিন্তু ডিরোজিও তাঁর ১৮২৮-২৯ সালের হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মানস-মুকুল কুসুমিত হ'তে দেখে অদূর ভবিষ্যতে দেশের যে নিশ্চিত সম্ভাবনার সুখে নিজের অস্তিত্ব সার্থক বলে মনে করেছিলেন, সেই ভবিষ্যতেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের উজ্জ্বল অন্বয়-সাধক বিবেকানন্দ দেখা দেন।[৩]

৩। ডিরোজিও তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতায় লেখেন—

> What joyance rains upon me when I see
> Fame in the mirror of futurity
> Weaving the chaplets you have yet to gain,
> And then I feel I have not lived in vain.

'Studies in the Bengal Renaissance'—অতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত [ডিসেম্বর ১৯৫৮] গ্রন্থে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ 'Derozio and Young Bengal' —পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের এই সংযোগ কষ্টকল্পনা মনে করলে ভুল হবে।[৪] কলকাতার যে ড্রামণ্ড সাহেবের ইস্কুলে ডিরোজিও পাঠ নিয়েছিলেন, সেই ড্রামণ্ড ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এই সাহিত্য-প্রেমিক, দর্শনানুরাগী স্বাধীনচিন্তার মানুষ ড্রামণ্ডের ব্যক্তিত্বের ফলে পোর্তুগীজ-ভারতীয় সন্তান ডিরোজিও নিজেও হয়ে ওঠেন গুরুর মতো প্রবল ব্যক্তিত্বময়, চিন্তাশীল, কর্মযোগী। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ,—মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক,—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইত্যাদি প্রত্যেকেই যে একই বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন, তা নয়। তাঁরা সে-যুগের পৃথক পৃথক ব্যক্তি ; প্রত্যেকেরই পৃথক পথ ছিল, পৃথক কৃত্য ছিল। কিন্তু বেকন, লক, হিউম, বেন্থাম, স্মিথ, পেইন ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলের চিন্তার আলোয়, ডিরোজিওর শিক্ষাতেই এঁরা মেলবার একটি অবলম্বন পেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাল্যে, কৈশোরে ব্রাহ্মচিন্তার যে ব্যাপক প্রভাব গেছে, এদেশের নবযুবকদের মনে ডিরোজিওর প্রভাব ঠিক তার আগের ঢেউ।

বলা বাহুল্য, এই দুটি ছাড়া সেকালে আরো ঢেউ ছিল—খ্রীষ্টান হবার ঢেউ, আবার রক্ষণশীলদের ঢেউ! রাধাকান্ত দেবের [১৭৮৪-১৮৬৭] মতন মানুষও স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন, সতীদাহ ঘটলে কষ্ট পেতেন। বাংলা-দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার যথার্থ উন্নতি চেয়েছিলেন তিনি। নরেন্দ্রনাথের জন্মের ছ' বছর আগে তিনি নিজে শোভাবাজারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সংস্কৃত কলেজ খোলেন। তবু রক্ষণশীল আর প্রগতিবাদী—নানা ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল নিরন্তর। বিবেকানন্দের মধ্যে সমস্ত শতাব্দটি বোধ হয় গভীর এক পরিণামে এসে পৌছোয়!—প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ অন্বয়চিন্তায়!

৪। অতীন্দ্রনাথ বসু ঐ একই সংকলনে তাঁর 'Swami Vivekananda' প্রবন্ধে লিখেছেন—'It was Rammohon Roy who stemmed the tide of cultural metamorphosis and started a phase of intellectual renaissance, But his was a voice of genius which reached the intellect of a few. Vivekananda's was the voice of the soul. It went into the heart of the nation and restored it firmly on its feet'.—পৃষ্ঠা ১০৮ দ্রষ্টব্য।

সমাজমনের অবসাদমুক্তি

নরেন্দ্রনাথের জন্মবৎসরেই ভারতের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) প্রসিদ্ধ ভাষণটি পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে জাতিভেদের অবাঞ্ছিত বৈষম্য দূর করবার সংকল্প ছিল তাতে। স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা,—পল্লী-অঞ্চলের এবং শ্রমিক-সমাজের শিক্ষা,—নারীর স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারও তিনি ভেবেছেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হননি, কেশবচন্দ্রের এক পয়সার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' তখন সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' সেই সত্তরের দশকের রচনা। ১৮৭৯তে বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রকাশিত হয়। 'সাম্য'তে তিনি যা লিখেছিলেন, তাঁর সেইসব কথা তিনি পরে নিজেই পুরোপুরি সমর্থন ক'রতে সম্মত ছিলেন না। আজ এ তথ্য সুপরিচিত; অতএব এখানে কেবল এইটুকুই স্মরণযোগ্য যে, এই ধরনের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল সারা পৃথিবীর,—এবং বিশেষভাবে বাংলা ও ভারতবর্ষের সমাজ-অভিমুখী; দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দেশের কতকটা তুলনামূলক পর্যালোচনায় তিনি এগিয়েছিলেন; তৃতীয়ত মানুষের আর্থিক বৈষম্যের আলোচনাতেও তিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্পর্কিত আধ্যাত্মিকতার কথা তোলেন। যেমন, 'সাম্য'তেই দেখা যায়—

> 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলি বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে ঘনীভূত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানে তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।'

নরেন্দ্রনাথ যখন কৈশোর উদ্‌যাপন ক'রছিলেন বাংলার নানা মনীষীর চিন্তায় তখন এইভাবে আমাদের জাতিমন ও ব্যক্তিমনের ভূমি-বিচার চলছিল। বঙ্কিম আর কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন একই বছরে। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নানা আলোচনা স্মরণীয়। ভূদেবের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় ভাগে বাঙালীর সমাজ, হিন্দুর ধর্মনীতি, পারিবারিক নীতি, পরধর্ম গ্রহণের ঔচিত্য-অনৌচিত্য ইত্যাদি আলোচনায় এবং তাঁর অন্যান্য লেখাতেও এই মনোভূমি-বিচারের অনুশীলন দেখা যায়। বঙ্কিম যেমন আমাদের ধর্মক্ষেত্রে নিবৃত্তিপ্রীতির সঙ্গে দেশের জলবায়ুর যোগটি তাঁর একাধিক রচনায় দেখিয়েছেন, ভূদেব তেমনি হিন্দুর বিনয়, উদারতা ইত্যাদি অন্যান্য আদর্শের দিকে তর্জনী-সংকেত ক'রে গেছেন। 'হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডুকতা' প্রবন্ধটি এই প্রবণতার উদাহরণ। 'পরধর্মগ্রহণ' প্রবন্ধের মন্তব্যও এইসূত্রে মনে পড়ে। তিনি লেখেন—

'হিন্দুধর্মের অতি ব্যাপকতাবশতঃ ঐ ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক অপর কোন ধর্মগ্রহণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন সকলের পক্ষেই আপন আপন পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করা কেবল পাগলামি। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় যে পরিমাণ তাহার ধর্মও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত বা অবনত হইবে। ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতি কোন একটি দুইটি সূত্র জানা থাকা বা না জানা থাকা নয়। ধর্মশাস্ত্র যে সকল বস্তুর কথা বলে, যথা 'ঈশ্বর', 'পরকাল', 'প্রাক্তন' ইত্যাদির 'অপ্রকৃত' হইতে 'প্রকৃতভাব' পাওয়া আর কিছুই নয়

শুধু 'অপরিস্ফুট' হইতে 'পরিস্ফুট' বোধ লাভ। এইজন্য একটি ধর্ম গিয়া আর একটি হয় না।'

মনে পড়ে, ১৮৭০-এ ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের ভাষণ 'England's Duties to India'। ইংরেজকে তিনি ভারত-কল্যাণের অছি হিসেবে ভারত-শাসনের পরামর্শ দেন। খ্রীষ্টীয় সহিষ্ণুতা রক্ষার জন্যে ইংরেজের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদন উচ্চারিত হয়। ইংলণ্ড ছেড়ে আসবার আগে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—'The result of my visit to England is that I came as an Indian, I go back a confirmed Indian'। রাজনারায়ণ, কেশব, ভূদেব—এঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয়তা বজায় রাখবার দিক থেকে ছিলেন সমভাবী। রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্ম-সম্পর্কিত আলোচনা দেখে ভূদেবের তাই খুবই ভালো লাগে। 'ব্রাহ্মধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র' প্রবন্ধটিতে এই 'সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজীওয়ালা' রাজনারায়ণের প্রশংসায় তিনি লেখেন—

> 'আমাদিগের দেশের চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ এবং সর্বপ্রাধান্য প্রকটনপূর্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিদ্য, অপরিণামদর্শী, অন্যচিকীর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি' প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের আশির দশকে—১২৯৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'। পরে 'প্রবন্ধমালা' নামে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে এটিও গ্রন্থভুক্ত হয়। এই লেখাটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন বাঙালী মনোভূমির প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছিলেন—

> 'ইংরাজি আমলের অনতিপূর্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম এবং মুরসিদাবাদের নবাবী রীতি-নীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার প্রভূত কার্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইল ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়ক পদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরাজি সভ্যতার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। নব্যবঙ্গ সেই বিবাহের শুভফল।'

বাংলার এই নতুন যুগ-সৃষ্টিতে রামমোহনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরো বিশ্লেষণ এবং প্রশস্তি ব্যক্ত হয় এই লেখাটিতে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন—'তিনি নব্য-বঙ্গের জন্মদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সঙ্গে তিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মূল-পত্তন করিয়া গিয়াছেন।' এই 'স্থিতি' আর 'গতি'র তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জানান—'রামমোহন রায় বঙ্গের গতি ভালর দিকে ফিরাইবার জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন।'

মানব-সমাজ সব অবস্থাতেই গতির অভিপ্রায়ী। অতএব জাতির এই গতি-অভিপ্রায় যাতে কল্যাণের দিকে চালিত হয়, সেই-রকম ব্যবস্থাপনাই নেতৃত্বের গভীর দায়িত্ব। 'মনুর প্রদর্শিত পথে', অর্থাৎ যথাবিহিত ভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ ক'রে গেলেও,—আপাতদৃষ্টিতে 'সব ঠিক আছে' মনে হ'লেও সব ঠিক থাকেনা! দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্থিতিশীল'দের এই রকম বিভ্রম উল্লেখ ক'রে লেখেন—'গতিহীন স্থিতিশীল সমাজের উপর জ্ঞানের এক-বিন্দু আলোক পড়িলেই তাহার দিব্যত্ব ঘুচিয়া যায়।' নিজের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' স্মরণ ক'রে তিনি লেখেন—'এরূপ সমাজের নীচের লোকেরা

> কাঁপে সদা কর-যোড়ে, দিবা নিশি গ্রীবা অবনত।
> যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত ॥'

উপরের লোকদিগের—

> গর্ব অভিমান ওঠে সকল হইতে উচ্চে চড়ি,
> সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি ॥"

সমাজের গতি, এবং স্থিতি,—আমাদের অনুকরণস্পৃহা আর স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা, —মানুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি—উনিশ শতকের এইসব সুপরিচিত বিষয়গুলিই দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও পুনরালোচিত হয়। ভূদেব যেমন পরধর্ম গ্রহণের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়ে গেছেন, ১৮৯০-এর (বঙ্গাব্দ

১২৯৭ ?) 'আর্যামি এবং সাহেবি আনা' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক সহযোগে তাঁর সমকালে এদেশে এবং বিদেশে 'আর্য' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য ক'রে মৎস্য-রূপক ব্যবহার ক'রে লেখেন—

> 'ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে আর্যাবর্তের পুষ্করিণীতে এবং তথা হইতে অমরকোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মৎস্যটি মর্তলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্‌স্‌মুলার ভট্ট দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া—আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে—সূর্যের উদয়াস্তস্পর্শী মহাসমুদ্রে প্রত্যানয়ন করিলেন।'

কিন্তু দেশের এই জাগৃতির সূচনা যে ম্যাক্‌স্‌মুলারের ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণারও পূর্ববর্তী, সে-কথা জানাতে গিয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ রামমোহনের উল্লেখ করেন—

> 'যখন ম্যাক্‌স্‌মুলারের নামও কেহ জানিত না—ম্যাক্‌স্‌মুলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতেছেন—সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রুতিস্মৃতিপুরাণের মর্মনিহিত সার সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে—সেদিকে কেহই বড় একটা কান পাতিলেন না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগরীর বক্ষপ্রদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অগ্নিময় বাক্যসকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে—তাহা কাহারো গ্রাহ্যে আসিল না; বিলাত হইতে আর্যমন্ত্রের আমদানি হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য আর্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন… ।'

বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী এবং সমকালীনদের মধ্যে কেবল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই যে রামমোহনের কাজের গুরুত্ব অনুভব ক'রে গেছেন, তা নয়। অনেকেই লিখেছেন, অনেকেই তা দেখিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের সমাজ-ভাবনার বা তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য নিরূপণের কাজে নামলে যারা

শতাব্দীর নানা ভাবুক ও কর্মীর জীবন থেকে দেশের ব্যাপক এই অবসাদ মুক্তির এইরকম কতো যে নজীর মনে আসে! এখানে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা হোলো এবং একই কারণে অতঃপর আরো দু'এক জনের জীবনকথার ঈষৎ বিস্তৃত আলোচনাও মার্জনীয়।

সেকালে পশ্চিম ভূখণ্ডের ভাব-সাধনার সংস্পর্শ আমাদের মননশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নানাভাবে আকর্ষণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একসময়ে বলেন—'বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেবদেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জল-মাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ-দেবী, বাংলাদেশ। নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্তর থেকে।...বন্দেমাতরম্ অহিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নাস্তিকতার সুরা। এই মন্ত্রে কঁৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজ-সেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে'।[৫]

'ভক্তিমার্গী নাস্তিকতা' কথাটি উনিশ-শতকের বাংলার বিদ্রোহ-ভাবনার পূর্ণপরিচায়ক নয়, আংশিক ইঙ্গিত মাত্র! কিন্তু কথাটি সত্যিই চমৎকার। নাস্তিকতা ভক্তিনির্ভর হয়ে সেকালে লোককল্যাণকেই লক্ষ্য বলে মেনেছিল। বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগর কেউই নাস্তিক ছিলেন না। এঁদের অথবা এঁদের মতন আরো অনেকের জীবন কখনোই ঠিক নাস্তিকের কর্মকথা বলা চলে না। নাস্তিক্য-আস্তিক্য, উভয় ক্ষেত্রেই সেকালে অভ্যাসের বিরুদ্ধে, প্রথার বিরুদ্ধে কতকটা প্রতিবাদের ঝাঁজ ছিল। রামমোহনই প্রথম এই তর্ক-বিচারের,—অর্থাৎ মুক্ত দৃষ্টির পথ খুলে দেন। ডিরোজিও এসে তাতে সত্যিকার গভীর আবেগ সঞ্চারিত করেন। বোধ হয়, ডিরোজিওর আসল কাজ মানে এই উদ্দীপনা-সঞ্চারের সামর্থ্য! এ কাজের গৌরব কম নয়।

স্কুল-কলেজের হাওয়া হওয়া চাই তর্কের হাওয়া। সে-হাওয়া সেকালের মনে ধরে গিয়েছিল। এদিক দিয়ে ডিরোজিও রামমোহনের সহকর্মী হিসেবেই স্মরণীয়। কিন্তু রামমোহন নাস্তিক ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন ইত্যাদিও গভীর ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামও এই ধারাতেই স্মরণীয়।

৫। বিনয় সরকারের বৈঠকে [দ্বিতীয় ভাগ] ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৬৪ দ্রষ্টব্য।

যেমন প্যারীচরণ সরকারের প্রসঙ্গ, তেমনি বিজয়কৃষ্ণের কথাও এখানে ভাবা যেতে পারে। আবার, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির সমসাময়িক ব্রহ্মবান্ধবের কথাও স্মরণযোগ্য। বিবেকানন্দের জীবনচিন্তা ও কর্মসাধনার প্রাক্-কথা হিসেবে এসব খুবই প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

বিজয়কৃষ্ণের পিতার নাম আনন্দকিশোর, জননীর নাম স্বর্ণময়ী। ১২৪৮ সালের ১৯-এ শ্রাবণ, সোমবার (২রা আগষ্ট, ১৮৪১) নদীয়া জেলার শিকারপুরের সন্নিহিত দহকুল গ্রামে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দকিশোরের জ্যাঠতুতো ভাই গোপীমাধব গোস্বামী মৃত্যুর সময়ে আনন্দকিশোরকে বলেন যে, তাঁর একটি সন্তানকে তিনি যেন গোপীমাধবের স্ত্রীর কাছে দত্তক রাখেন। কিন্তু দত্তক প্রদানের আগেই আনন্দকিশোর লোকান্তরিত হন। শিশুর পাঁচ বছর বয়সে জননী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণমণির হাতে বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক দেন। সীতানাথ গোস্বামীর 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' বইখানিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এর অল্পকাল পরেই কৃষ্ণমণির মৃত্যু হয়। স্বর্ণময়ীকে অচিরে তাঁর এই সন্তানের পরিচর্যার ভার নিতে হয়।

১২৬৫-৬৬ সালে বাল্যবন্ধু অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ কলকাতায় আসেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তখন কিছুদিন সাঁতরাগাছিতে চৌধুরী-বাড়িতে বাস করেন এবং রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন যোগমায়ার বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই বিজয়কৃষ্ণের বেদান্তচর্চা শুরু হয় এবং তিনি ঘোর বৈদান্তিক হয়ে ওঠেন।

শিষ্যের কুলগুরু হয়ে তিনি একবার বগুড়ায় যান। এক বৃদ্ধা তাঁর শিষ্যা ছিলেন। তিনি নিজের হাতে গুরুর পা ধুইয়ে দিয়ে গুরুর কৃপায় ভবযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কামনা করেন। এই ঘটনায় বিজয়কৃষ্ণ বেশ বিচলিত হন। একদিকে যুক্তিতর্ক, অন্যদিকে অলৌকিক অভিজ্ঞতা—তাঁর জীবনে দুইই ঘটতে থাকে। একদিন হঠাৎ 'পরলোক চিন্তা কর'—এই ধ্বনি শুনতে পান। আর একবার বগুড়ায় গিয়ে কিশোরীনাথ রায়, হারাধন বর্মণ এবং গোবিন্দচন্দ্র পাঢ়ে নামে তিনজন শিক্ষিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। এঁদেরই অনুরোধে তিনি কলকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম-উপাসনার-

ভাষণ শুনতে যান। কলকাতায় এক বন্ধু তাঁর টাকাপয়সা চুরি করে। বিজয়কৃষ্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘোরেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগরের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাঁকে এই সময়ে নিরাশ হতে হয়। দেবেন্দ্রনাথও নাকি তাঁর সাহায্যের আবেদন ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। দেবেন্দ্র-নাথের উপদেশ শুনে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ পরিত্যাগ ক'রে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তারপর ১২৬৭-৬৮ সালে অঘোরনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র-নাথকে তিনি পরে একদিন উপবীত ত্যাগ করা উচিত কিনা এবং মৎস্য-মাংস আহার সংগত কিনা জিগেস করেন। দেবেন্দ্রনাথ বলেন, উপবীত রাখা উচিত, মাছ-মাংস খাওয়াও দরকার। কিন্তু মেডিকেল কলেজের বন্ধুদের 'হিতসঞ্চারিণী সভা'র সভ্য হয়ে উপবীত ধারণ একরকম কপটতার চিহ্ন মনে ক'রে বিজয়কৃষ্ণ একদিন উপবীত ত্যাগ করেন।

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে সর্বসমেত তিন বছর পড়েছিলেন তিনি। সংস্কৃত কলেজে তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের তৃতীয়-বর্ষের ছাত্রাবস্থাতেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলযোগের ফলে তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের সমাজ থেকে বেরিয়ে, কেশবচন্দ্র ঐ বছর এগারই নভেম্বর (২৬-এ কার্তিক, ১৭৮৮ শকাব্দ) তাঁর পৃথক সমাজ—অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা, উপনিষদ ইত্যাদি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্রের সার কথা গ্রহণ ক'রে,—জ্ঞান,সত্য, প্রেম, বিশ্বাস—এইসব আদর্শের ওপরে এই নতুন সম্প্রদায়ের আদর্শচিন্তা এবং জীবন-নিরীক্ষার পত্তন হয়। ১৮৬৯এর আগষ্ট মাসে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা শুরু হয়। ১৮৭০-এ তিনি বিলেত যান। তার দশ বছর আগে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে ব্রাহ্ম সঙ্গত-সভা হয়। এই সঙ্গত-সভার এক অধিবেশনে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় হয়। সেই সভায় 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামে এক পুস্তিকায় তিনি তাঁর এই নির্দেশ দেন যে, উপনয়নের সময় ব্রাহ্মদের উপবীত পরিত্যাজ্য।

উপবীত ত্যাগের ফলে বিজয়কৃষ্ণের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। শান্তিপুরের গোস্বামীরা ছিলেন তাঁর খুবই বিরোধী। তাঁর বড়ো ভাই ব্রজগোপাল গোস্বামী প্রকাশ্য সভায় তাঁকে ত্যাগ করেন। যখন আত্মীয়বন্ধু সকলেই তাঁকে এইভাবে পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁর ভগিনীপতি কিশোরীলাল মৈত্র তাঁকে আশ্রয় দেন।

বিজয়কৃষ্ণের এই অন্তর্জীবনের কথা জানতে হলে তাঁর আত্মজীবনী 'আশাবতীর উপাখ্যান' পড়া দরকার। কিন্তু সে-সব আলোচনা এখানে বাহুল্য। এখানে এই কথাই বিশেষ স্মরণযোগ্য যে, বিবেকানন্দের মধ্যে উনিশ শতকের হিন্দু আধ্যাত্মিকতার যে অবসাদমুক্তি ঘটেছিল, সেটি একান্ত কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; গত শতকে ভূদেব, ব্রহ্মবান্ধব, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকেই অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মযোগী ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছিলেন সেই ভূমিতেই।

১৭৮৪ শকাব্দের (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) শেষদিকে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হবার সংকল্প গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরে প্রধান আচার্যের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। আচার্য প্রথমেই তাঁকে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার দেন। তাই রামকৃষ্ণপুর, সাঁতরাগাছি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর এবং কলকাতার একাধিক সমাজে উপদেশ-প্রচারে বিজয়কৃষ্ণ আত্মনিয়োগ করেন। বাগআঁচড়া, চাকদহ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলেও তিনি ভ্রমণ এবং প্রচার করেন। যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চলে অনুরূপ প্রচারকার্যে কিছুকাল যায়। উপবীত ধারণ করা যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পক্ষে অসংগত,—কেশবচন্দ্রকে তিনি তাঁর এইমত জানান। কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে সে-চিঠি দেখান। দেবেন্দ্রনাথ তা অনুমোদন ক'রে বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বা বেদান্তবাগীশ বা বেচারামবাবু এঁদের মধ্যে কেউই উপবীত ত্যাগ ক'রবেন না। এ অবস্থায় উপবীতত্যাগী দুজন যোগ্য লোক পাওয়া গেলে সে-কাজ তাঁদেরই দেওয়া যায়। কেশবচন্দ্র অতঃপর অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে এবং বিজয়কৃষ্ণকে সে-বিষয়ে অনুরোধ করেন। ১২৭১ সালের (১৭৮৭ শক) সাতই ভাদ্র, বিশেষ উপাসনা ক'রে প্রধান আচার্য এঁদের দুজনকেই উপাচার্যপদে বরণ করেন।

নতুন ব্রাহ্মদের উদ্যোগে একদিকে এই নতুন উপাচার্য নিয়োগে,—অন্যদিকে অসবর্ণ বিবাহের চেষ্টা ইত্যাদি কয়েকটি সংস্কারের ফলে, সমাজে বিরোধ বাড়তে থাকে। কিন্তু মতামতের বিরোধ-বিতর্ক যাই ঘটুক, সেই বিরোধের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ উনিশ শতকের কর্মনিষ্ঠ আরো নানা জ্ঞানীর জীবনই যাপন ক'রে গেছেন। সেই কাজের মূলে শুধু শুভবুদ্ধি নয়, গভীর ভাবাবেগ ছিল। এই মন্তব্যের নজীর হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা চলে। ১২৭১ সালের ২০-এ আশ্বিন (১৮৬৪) কলকাতায় প্রবল এক ঝড় হয়। রাস্তায় সাঁতারজল থাকা সত্ত্বেও, বিজয়কৃষ্ণ সেই সন্ধ্যায় সাঁতার দিয়েই সমাজের মন্দিরে যান। কারণ, সে দিনটি ছিল বুধবার,—প্রার্থনার দিন। কাজে শৈথিল্য ঘটতে দেবার মানুষ ছিলেন না তিনি! এই ঝড়ে ব্রাহ্ম-সমাজের বাড়িটির খুব ক্ষতি হয়। এর পর, কিছুদিন, দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা চ'লতে থাকে।

ঝড়ের পরের বুধবার দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে বলেন—অন্নদাবাবু অসুস্থ, অতএব বিজয়কৃষ্ণ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী উপাসনা পরিচালনা ক'রবেন। কিন্তু পাকড়াশী ছিলেন উপবীতধারী। তাই, কেশবচন্দ্র এবং বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই ক্ষুণ্ণ হন। বিজয়কৃষ্ণ মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে, উপবীতধারী আচার্যের উপাসনায় যোগ দিতে সকলকে বাধা দেন। এইভাবে বিরোধ আরো বেড়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেই ১২৭১ সালে স্বতন্ত্র এক প্রচার-বিভাগ গড়ে তুলে ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সংকল্প নেন।

১২৭১-এর কার্তিক থেকে নবীন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' মাসিক হয়ে প্রকাশিত হয়। ঐ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ঢাকার ব্রজসুন্দর মিত্রের অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা-বিদ্যালয়ে যান। অঘোরনাথ সেখানে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন আর বিজয়কৃষ্ণ পূর্ববঙ্গে প্রচারকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রজসুন্দরকে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকদের সাহায্যকল্পে একটি তহবিল খুলতে বলেন। সে-তহবিলের জন্যে একদিনেই সাতশ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু উপবীতত্যাগ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের চেষ্টা ইত্যাদির ফলে ঢাকাতেও ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধ শুরু হয়ে যায়। ব্রাহ্মদের 'ঢাকাপ্রকাশ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা 'হিন্দুহিতৈষিণী' দেখা দেয়। ব্রজসুন্দর মিত্র তখন

কুমিল্লায়। বিজয়কৃষ্ণ পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হন। কুমিল্লায়, বরিশালে তাঁর প্রচারকার্য চলতে থাকে।

অসুস্থ হয়ে অতঃপর তাঁকে কিছুদিন শান্তিপুরে কাটাতে হয়। ১২৭২ সালের ৩০এ আশ্বিন কেশবচন্দ্র এবং অঘোরনাথের সঙ্গে আবার তিনি পূর্ববঙ্গে যান। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকাতেই থাকেন, তারপর, বরিশাল, নোয়াখালি হয়ে চট্টগ্রামে যান।

সে-যুগে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজে বা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই যে এই কর্মোদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, তা নয়। নবীন-প্রবীণ, হিন্দু, ব্রাহ্ম সকলেই সেই গভীর জাগৃতির উদ্দীপনায় সহযোগী ছিলেন। ১২৭৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। এই বছর মাঘোৎসবে প্রথম নগর-সংকীর্তন হয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল নগর-সংকীর্তনের গান লেখেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এই কীর্তনে আকৃষ্ট হন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটে। ১৮৬৯এর শীত-ঋতুতে ময়মনসিংহে বিজয়কৃষ্ণ 'অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁকে' গান করেন।

উনিশ-শতকের প্রথমার্ধে যেমন নব্যবঙ্গের 'ভাঙ্ ভাঙ্' রব,—শেষার্ধে তেমনি এই 'অখিলতারণ' আহ্বান! সে শুধু কর্মপ্রয়াসহীন সমর্পণের আহ্বান ছিল না। অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ ক'রে এ-ধারণার সমর্থন দেখানো যায়। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ একবার তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। ঐ বছর ৭ই পৌষ বোলপুরে মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে যাবার জন্যে মহর্ষি তাঁকে নিমন্ত্রণ জানান। বিজয়কৃষ্ণ অবশ্য উৎসবে যেতে পারেন নি। তবে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সাক্ষাতে মহর্ষি বলেন—জ্ঞান কেবল কথার কথা, প্রেমই ঈশ্বরকে পাবার একমাত্র উপায়। তিনি বলেন জ্ঞান, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারটি একসঙ্গে থাকা চাই। বিজয়কৃষ্ণের তা ছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সাক্ষাতেই মহর্ষিকে বলেন—'আপনি ত' আমাকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়াছেন।'

বিজয়কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আর বাড়াবার দরকার নেই। নরেন্দ্রনাথের সমকালে

জ্ঞান আর ভক্তি, দুয়ের যে কোনো পথে যাঁরাই এগিয়েছেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই গভীর সন্ধানের সংকল্প ছিল। বিজয়কৃষ্ণের জীবনের এইসব ঘটনায় সেই সংকল্পের সাধনাই দেখা গেল। আস্তিকের সঙ্গে নাস্তিকের,—রামমোহনের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের,—ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের[৬]—ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে নব্য হিন্দুদলের লোককল্যাণ-সাধনার এই গভীর এবং অবিচ্ছিন্ন যোগটি ঐতিহাসিক সত্য। একই বৃন্তে তখন স্বাধীনতা আর কল্যাণকর্ম দুই কুসুম হয়ে দেখা দেয়! রাজা রামমোহনের আমল থেকেই এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে। মনে পড়ে, রামমোহন সম্বন্ধে রেভারেণ্ড উইলিয়ম অ্যাডামের মন্তব্য—হয় স্বাধীনতা, না-হয় নাস্তি,—এই তাঁর পরিচয়! 'He would be free or not be at all!'

বিবেকানন্দও তাই-ই। তিনিও সেই রকম। তাঁর সঙ্গে সমকালীন ও পূর্বগামী কারও কারও প্রভেদ বোধ হয় এইখানে যে, তিনি কখনোই ভক্তি-মার্গী নাস্তিক হিসেবে প্রসিদ্ধি কামনা করেননি। বেদান্তে বিশ্বাসের সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমের গভীর যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। কঠোপনিষদ আর মুণ্ডকোপ-নিষদের বাণী তিনি স্বদেশ-সাধনার প্রেরণা হিসেবে অনুভব ক'রে গেছেন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে এই ব্রতপালনের জোর পেয়েছিলেন তিনি। রামমোহনের সময় থেকে জাতির যে অবসাদমুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিবেকানন্দের যুগে তারই জগজ্জয়ী পরিণতি ঘটে।

প্রসঙ্গত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'Men I have seen' প্রবন্ধগুলির কথা মনে পড়ে। তাতে শাস্ত্রীমশাই বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—এই সাতজন মনীষীর কথা লিখে গেছেন। এই লেখাগুলি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহযোগে শ্রীযুক্তা মায়া রায় সেই ইংরেজি লেখাগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই বাংলা

৬। হেয়ার সাহেবকে সুশোভনবাবু প্রায় আধা-হিন্দু বলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে ডিরোজিও আর হেয়ার—দুজনের সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি লিখেছেন—"both were 'godless' seculiarists with little faith in denominations or religious instruction, and yet staunch idealists."

সংস্করণের নাম 'মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে'। তাতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর একদিনের এই অভিজ্ঞতার কথা আছে—

> 'একদিনের ঘটনার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের সাধনার কথা বলিতেছেন, এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—গৃহীরা ধ্যান ধারণা করবে কখন? দিবারাত্র সংসারের কাজে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এ অবস্থায় ভগবদ্‌ভজনের অবসর কই? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—ওর মধ্যে হয়। গ্রামদেশের চিঁড়ে কুটবার সময় এক হাতে ঢেঁকির ভেতরের ধান ওল্‌টায়, আর এক হাতে শিশুকে স্তন দেয়, আবার ব্যাপারী এলে তার সাথে চিঁড়ের দরকষাকষি করে। করে সে সব কাজই কিন্তু মনটি দিয়ে রাখে ঢেঁকির গড়ের দিকে। সে জানে, অন্যমনস্ক হলেই তার হাত ঢেঁকির ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। সংসারী লোকেরা চিঁড়েকুটুনীর মতই সমস্ত মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে সকল কাজ করে যেতে পারে, তাতেই কাজ হবে'।

উনিশ-শতকের শেষার্ধকালে আমাদের মনন-আচরণের মূল আশ্রয় ছিল এই জগৎ-কল্যাণে অথবা ঈশ্বরে-সমর্পিত ঐকান্তিক নিয়োগের সততায়। পরবর্তী শতকের শেষার্ধে এসে আজ সেই কথাই বারবার স্মরণীয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী বা অন্যান্য যাঁদের কথা এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হোলো, তাঁরা প্রত্যেকেই সেই এক আদর্শের ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ। হিন্দু এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়বিভেদ সত্ত্বেও আমাদের সমাজে সেদিন অল্পবিস্তর এই সততারই প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' ক'রে সকলেই যে কলরব ক'রেছেন, তা নয়। কিন্তু জীবনের স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে কল্যাণের আদর্শ বরণ ক'রে কর্মনিষ্ঠা জাগিয়ে রাখাই ছিল তাঁদের কাজ।

আমাদের উনিশ-শতকের ভাব-কর্মের ব্যাপক জাগৃতির মূল সূত্রগুলি অনুসন্ধান করতে গেলে জ্ঞান এবং কর্ম, এই দু'টি পথই বিশেষভাবে মনোযোগ দাবি করে। য়ুরোপের সংস্পর্শে এসে মধ্যযুগের অবসাদ থেকে আমরা মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছি। এ-স্বীকৃতি ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন

ধর্ম-সম্প্রদায়ের সকল স্তরে সে-প্রভাব সমভাবে পড়েও নি, ছড়ায়ও নি। সমাজের যে-স্তরে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সহজ ধারার সঙ্গে নতুন বিদ্যা-অর্জনের প্রয়াস যুক্ত ছিল, সেই স্তরেই নবযুগের অবসাদমুক্তির প্রথম ঢেউ এসে লাগে এবং তারই ফলে সুদীর্ঘকালের হিন্দু আধ্যাত্মিকতার নতুনভাবে মূল্যায়ন শুরু হয়। সেদিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, হিন্দু আর ব্রাহ্ম, দু'টি আলাদা শব্দ বটে, কিন্তু একই প্রগতিমুখিতার প্রতিশব্দ।

সেকালে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পরিবারেও নতুন কালের হাওয়া প্রবেশ ক'রে বিশেষ বিশেষ মনে কী যে ঢেউ তুলেছিল, তারই আর একটি উদাহরণ হিসেবে একজন অসাধারণ 'সাধারণ' মানুষের কথা মনে পড়ে। বিবেকানন্দের জীবনের যে-অঞ্চল তাঁর সাহিত্যচিন্তায় এবং সমাজচিন্তাতেই সীমিত, সেইটুকুই এ আলোচনায় গৃহীত বিচরণক্ষেত্র। এই সীমার মধ্যে বিবেকানন্দের কথা ভাবতে গেলে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতন পূর্বগামীর কথা মনে আসে। বিশেষত সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে ভূদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের দেওয়া সূত্রগুলির অনেক সাদৃশ্য স্বীকার্য। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ জীবন-সাধনার বিচারে দুজনের বৈসাদৃশ্যই বেশি।

ভূদেবের জন্ম ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথের ১৮৬৩তে; ভূদেব সংসারী মানুষ, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী; ভূদেব বিলেত যান নি, বিবেকানন্দ য়ুরোপ আমেরিকায় গিয়ে ভারতবাণীর বৃহৎ ব্যাপক প্রচার ঘটিয়েছেন। তবু একযোগে সাহিত্য-সৃষ্টি আর সমাজচিন্তার দিক ভাবতে গেলে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের মধ্যে বিবেকানন্দের কথাসূত্রে ভূদেবের প্রসঙ্গই বেশি মনে আসে। তাই সংক্ষেপে তাঁর কথা অবশ্যই স্মরণীয়।

একজন পূর্বগামীর চিন্তা—'মাতৃভূমিই ঈশ্বরী-দেহ'

বাংলাদেশে যখন ইয়ং বেঙ্গলের কোলাহল শুরু হয়ে গেছে, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের হাতে একদিন ঈশোপনিষদের ছেঁড়া-পাতা উড়ে এসে পড়ে। সে ১৮৩৮-এর ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বছর। রামমোহন তার পাঁচ বছর আগে দেহত্যাগ ক'রেছেন। তৎপূর্বে ১৮২৮-২৯ নাগাদ কোনো এক বছর রামমোহনের কাছে এগারো-বারো বছরের বালক দেবেন্দ্র-নাথকে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ ক'রতে যেতে হয়। রামমোহন নিমন্ত্রণ পেয়েই বলেন—'বেরাদর! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।' অর্থাৎ প্রতিমা-পূজায় রামমোহন নিজে বিশ্বাস ক'রতেন না ব'লেই সে নিমন্ত্রণ এইভাবে সস্নেহে প্রত্যাখ্যান করেন।[১]

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যুক্তিনিষ্ঠ ছিলেন বটে, তবে রামমোহনের মতন শক্ত যুক্তিবাদী ছিলেন না। তাঁর জীবনে ভক্তির ঝোঁক ছিল শুরু থেকেই। ইয়ং বেঙ্গলের সমকালে পূর্ণ যৌবন যাপন ক'রেও তাই তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ ছিলেন ব'ললে ভুল হবে না। ১৮৩৫-এ তাঁর পিতামহীর মৃত্যুকালে, মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ঘটে। তারপর, তাঁদের সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র শ্যামাচরণের কাছে মহাভারতের আদিপর্বের কয়েকটি শ্লোক দেখে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেই ধর্মপিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন তিনি। ঈশোপনিষদের শ্লোক উড়ে এসে,—বোধ হয়, সেই কারণেই এদিক থেকে সে-যুগের যোগ্যতম মানুষ দেবেন্দ্রনাথের হাতেই পড়েছিল!

বিদ্যাসাগর বা মধুসূদনের তুলনায় ভূদেবের ভিন্নতা কতকটা এইরকম। ভূদেব অনেকটা আত্মসমাহিত। তাঁর কর্মজীবন বিদ্যাসাগরের মতন সংঘর্ষময় নয়, বিবেকানন্দের মতো চাঞ্চল্যজনক নয়! তবু, আমাদের সমাজ ও জাতি-বৈশিষ্ট্যের চিন্তায় বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর মিল অনুভব করা যায়।

১। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দের সঙ্গে ভূদেবের এই ভাবগত সম্পর্কের দিকটি মুদ্রিত প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। 'বিবেকানন্দ-শিক্ষাসূচী' নামে এক প্রবন্ধে ডক্টর কালিদাস নাগ স্বামীজীর উদ্ভাবিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে খুবই সংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধটির প্রথম কয়েক ছত্রের মধ্যেই দেখা যায়—

> 'তাঁর 'পত্রাবলীর' প্রথমেই দেখি বরানগর থেকে স্বামীজী ভিক্ষা করছেন অস্টাধ্যায়ী পাণিনির বিরাট সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং তাঁর কল্যাণ মিত্র ৺প্রমদাদাস মিত্র সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ডাকযোগে কাশী থেকে বরানগরে পাঠিয়েছিলেন, সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে যে সংস্কৃত ভাষার সম্যক অনুশীলন প্রয়োজন, সেটি স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বেলুড় মঠে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সংস্কৃত অধ্যাপনা করে গিয়েছেন।'

অধ্যাপক নাগ অনুমান করেন যে, সংস্কৃতের প্রতি বিবেকানন্দের এই অনুরাগের মূলে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণা,—কারণ, স্বামীজী বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। এটিই একমাত্র কারণ কি না, সে-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে স্বর্গত কালিদাস নাগের এই প্রবন্ধটির আর একটি উক্তি এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬র মধ্যে, ডক্টর উইলিয়ম হেষ্টি যখন জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু অধ্যাপক নাগের কথায়—

> ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি যে, আচার্য ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠের ফলে ভারতীয় দর্শনের অনুরাগ শুরু হয় এবং স্বামীজী যোগদর্শন সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাতঞ্জল দর্শন আলোচনা করতেন এবং পরে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের ভিত্তিস্বরূপে 'রাজযোগ' প্রকাশ করেন। তাঁর রুশভক্ত সেই 'রাজযোগ' গ্রন্থ টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন, মস্কো থেকে ১৯৬০

> খ্রীষ্টাব্দে ইয়ামা পালিয়ামা (Yama Paliyama) গ্রামে টলস্টয়ের পিতামহ-ভবনে আমি তা দেখে এসেছি।[২]

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ পড়তে পড়তে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে হঠাৎ একদিন গভীর যন্ত্রণা বোধ করেন ভূদেব। সে-রাত্রে, স্বপ্নে তাঁকে এক ব্রাহ্মণ দেখা দেন। প্রাচীন ও নবীন ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, বাণিজ্য, উপাসনা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে, ভূদেব তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় সেই ব্রাহ্মণেরই মুখ দিয়ে ব্যক্তিগত তপস্যায় এদেশের বিশ্বাস এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণবোধে এদেশের ঐতিহ্যলব্ধ অধিকারের সত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত বেশ জোরের সঙ্গেই জানিয়ে গেছেন।[৩] আমাদের স্মৃতি যেন ইতিহাসে নিবিষ্ট হয়,—আমাদের আশা যেন অতন্দ্র থাকে,—আর, যথার্থ তপস্যায় আমরা যেন বিমুখ না হই,—এই ছিল ভূদেবের বলবার কথা।

কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'ভূদেব-চরিত' বই থেকেই জানা যায় যে, পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের বয়স যখন তেত্রিশ বছর, সেই সময়ে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি—১২৩১ সালের ৩রা ফাল্গুন, কলকাতায় ৩৭, হরিতকী বাগান লেনে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর বয়স যখন চার পেরিয়ে পাঁচে পড়েছে, তখনও তাঁর বর্ণ-পরিচয় হয় নি।

২। উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ১২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৩। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কথাপ্রসঙ্গে এক ঐতিহাসিকের মন্তব্য—'If Plassey had sown the seeds of British Supremacy in India, Panipat afforded time for their maturing and striking roots.'—An Advance History of India' দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ [১৯৫৬], পৃষ্ঠা ৫৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪। এই তারিখ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা হয়েছে। ১৮২৫-এর বদলে ১৮২৭ ধরতে হবে। 'ভূদেব-চরিতের' উক্তি অনুসারে ভূদেবের জন্ম-তারিখ যদি ১৭৪৬ শক বা ১২৩১ সালের ৩রা ফাল্গুন ধরা হয়, তাহলে সেই সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ১৮২৫-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখটি অভ্রান্ত মনে ক'রতে আপত্তি উঠেছে। 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এই ইংরেজী বাংলা তারিখে মিল নাই—৩রা ফাল্গুন না হইয়া ২রা ফাল্গুন হওয়া উচিত ছিল। সালেও ভুল আছে।' 'ভূদেব-চরিত' এবং সংক্ষিপ্ত 'ভূদেব-জীবনী'—দুই গ্রন্থের প্রদর্শিত তারিখ অগ্রাহ্য করে, চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর এক পুঁথির মধ্যে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পিতামহ সার্বভৌম পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতে-খড়ি দেন। কিছুদিন বাড়িতে পড়ে, ন-বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর তাঁর সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পারিবারিক আগ্রহের উত্তরাধিকার বজায় রাখতে তিনি মোটেই অক্ষম ছিলেন না। কলেজে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন হরনাথ তর্কভূষণ। হরিতকী বাগানের বাড়িতে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সঙ্গে হরনাথ এবং অন্যান্য শিক্ষকরাও দেখা ক'রতে আসতেন, আর, তাঁরা এলেই সংস্কৃত ব্যাকরণে ভূদেবের পরীক্ষা হোতো। এই সময় উল্‌স্টন নামে এক সাহেব এবং দুজন বাঙালী শিক্ষক সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। এই সাহেবের আগ্রহে ভূদেব ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হন। ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার দিকেই তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। বিশ্বনাথ অতঃপর ছেলেকে রামমোহন রায়ের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি'তে ভর্তি ক'রে দেন। তখন পূর্ণচন্দ্র মিত্র ছিলেন সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রধান শিক্ষক।

তের বছর বয়সে ভূদেবের উপনয়ন হয়; তার আগেই পিতামহ সার্বভৌম লোকান্তরিত হন। সেজন্যে উপনয়ন এক বছর পিছিয়ে যায়। এই সময় ভূদেব কিছুদিনের জন্যে তাঁর পুরোনো ইস্কুল ছেড়ে মধু চক্রবর্তীর ইস্কুলে যান এবং তার অল্পকাল পরে হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি হবার জন্যে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভূদেবের পুরোনো ইস্কুলের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক নবীনমাধবের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের নাকি এই রকম এক চুক্তি ছিল যে, নবীনমাধবের কোনো ছাত্রকে হেয়ারসাহেব তাঁর নিজের ইস্কুলে ভর্তি ক'রবেন না। হেয়ার ভেবেছিলেন যে, ভূদেব তখও নবীনমাধবের ইস্কুলেই পড়ছিলেন। ফলে, ভূদেব আর হেয়ার-স্কুলে ভর্তি হন নি। চোদ্দ বছর বয়সে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজে তাঁর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে গৌরদাস বসাক, মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি সেকালের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অনেকেই ছিলেন।

ভূদেবের যে কোষ্ঠী পেয়েছিলেন, তিনি সেই তারিখই সমর্থন করেন। সে তারিখ—২২এ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭,—১৭৪৮ শকের ১১ই ফাল্গুন। ভূদেবের দিনলিপিতেও এই শেষোক্ত তারিখই সমর্থিত হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত' বইখানিতে প্রকাশিত গৌরদাস বসাক, মধুসূদন, ভূদেব, ভোলানাথ চন্দ্র ইত্যাদির চিঠিপত্রের মধ্যে গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা মধুসূদনের একখানি চিঠিতে ভূদেবের মায়ের উল্লেখ আছে। ভূদেবের নিজের কথায়—তাঁর মা ছিলেন 'অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী'।[৫]

হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় ভূদেব গণিতে বেশ মনোযোগী ছিলেন, আবার কাব্যেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, 'ভূদেব-চরিত'-এর ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় সেই সময়ের এক চিত্তাকর্ষক উল্লেখ আছে। দেবপূজা যে হিন্দুর পৌত্তলিকতা মাত্র,—বার বার এই কথা শুনে ভূদেবেরও মনে এই ধারণা দেখা দেয়। একদিন বাড়ি ফিরে, তাই তিনি গৃহদেবতার আরতি করেন নি। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সেদিন একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফেরেন। তিনি সব কথা শুনে কাউকে কিছু না ব'লে নিজেই ঠাকুরের আরতি করেন। পরদিন ছেলেকে আরতি না করবার কারণ জিজ্ঞেস ক'রলে ছেলে জবাব দেন যে, পৌত্তলিকতা পাপ,—সে পাপে তাঁর মন নেই। তর্কভূষণ বলেন যে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না, অতএব ভূদেব আরতি না ক'রে ভালই ক'রেছেন। তবে ভূদেব যখন তাঁর একমাত্র পুত্র, তখন দুজনের আরো বেশি দেখাসাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এই ব'লে, পরদিন থেকে পিতাপুত্র একসঙ্গে প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নান শুরু করেন। যথার্থ বিবেচক পিতার এই সহিষ্ণুতা এবং সান্নিধ্যের ফলে ভূদেবের মনের পরিবর্তন হয়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ভূদেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

৫। ভূদেবের নিজের কথায়—"বিশপ্স কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মাদ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল,—'আমার প্রণীত ক্যাপ্টিভ লেডি নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।' বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। তরল সৌন্দর্য তাঁহার ছিল না; যে সৌন্দর্যে প্রকৃত মাতৃভাষা ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণা মূর্তি তাঁহার ছিল। আমি মধুর উক্ত পত্রের জবাব দি। কিন্তু ইহার পর হইতেই পরস্পরের সংস্রব বেশী না থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়া যায়।' —[৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৮৬-৮৭ দ্রষ্টব্য]

বিশ্বনাথ তাতেও কিঞ্চিৎ দুঃখিত হন, কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, ভূদেব সম্ভবত নিষিদ্ধ খাদ্যের লোভে কৃষ্ণমোহনের কাছে যাতায়াত করেন, কিন্তু ভূদেবের নিজের মুখে তার প্রতিবাদ শুনে বিশ্বনাথের সে-সংশয় দূর হয়। এই সময়ে ভূদেব ডেভিড হিউমের দার্শনিক প্রবন্ধ এবং টম্‌পেন, গিবন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা পড়ে ফেলেন। এদিকে, বিশ্বনাথ নিজে ছেলেকে গায়ত্রী মন্ত্রের মানে বুঝিয়ে দেন। ভূদেবের 'আচার-প্রবন্ধে' তাঁর সেই বাল্যকালের স্মৃতির প্রতিধ্বনি আছে। তাঁর জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। 'পারিবারিক প্রবন্ধে' সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যেখানে আলোচনা ক'রেছেন, সেখানে নিজের জীবনেরই এই অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি আছে।

তর্কভূষণ বিশুদ্ধাচারী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন; তন্ত্রবিদ্যার অনেক গূঢ় ব্যাপার তিনি তাঁর ছেলেকে জানিয়ে গেছেন। ভূদেবের বিবাহের এক বছর পরে, তর্কভূষণ নিজে ভূদেবজননীর দ্বারা পুত্র-পুত্রবধূ দু'জনকেই দীক্ষিত করেন।

সন্ধ্যাবন্দনা, তন্ত্রোপাসনা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ আকৃষ্ট হবার পরে ডাফ সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হয়। একদিন হরিতকী বাগানের বাড়িতে গিয়ে ডাফ সাহেব তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম-বিদ্বেষী ফরাসী গ্রন্থকার ভলটেয়ার লিখিত "মহম্মদ" বইখানির ইংরেজি অনুবাদ পড়তে দেখেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় দেখা যায়—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ক'রে, ভূদেব সেখানে দু'বছর ছাত্র ছিলেন। তারপর 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমিতে', নবীনমাধব দেব ও ভোলানাথ স্কুলে—মোট এই তিনটি বিদ্যায়তনে তিনি পরপর পাঠ গ্রহণ করেন। ১৮৩৯-এ হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে প্রবেশ ক'রে, ১৮৪১-এ সিনিয়র বিভাগে পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের 'পরিশিষ্ট' অংশে ভূদেবের নিজের কথা উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভূদেব যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, মধুসূদনকে তিনি সেই সময়েই সহাধ্যায়ী পান।

১৮৪২-এ ভূদেব যখন দ্বিতীয় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এক প্রতিযোগিতা-মূলক প্রবন্ধ লিখে মধুসূদন পান প্রথম পুরস্কার, ভূদেব পান দ্বিতীয় পুরস্কার। দুটি পুরস্কারই রামগোপাল ঘোষের দেওয়া।

সেই ১৮৪২-এ সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে, ভূদেব চল্লিশ টাকা বর্ধমান-রাজ-বৃত্তির অধিকারী হন। মোট দু'বছর পাঁচ মাস হিন্দু কলেজে কাটিয়ে, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। তার আগেই মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুও হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ভূদেবের আগেই ভোলানাথ চন্দ্র হিন্দু কলেজে ঢুকেছিলেন। বয়সে ভূদেবের চেয়ে বছর পাঁচেক বড় ছিলেন তিনি। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, ১২২৯ সালের ১০ই আশ্বিন নিমতলা ষ্ট্রীটের বাড়িতে ভোলানাথের জন্ম হয়। ১৮২৯-এর ১লা মার্চ গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্থাপিত হবার পরের বছর ১৮৩০ সালে ভোলানাথ ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৩২-এর সেপ্টেম্বরে কিংবা অক্টোবরে তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। সে সময়ে হিন্দু-কলেজের কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ইত্যাদি।

১৮৩৫-এ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্বেই এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। ছাত্র হিসেবে ভোলানাথ ইংরেজি সাহিত্যে এবং ইতিহাসে খুবই অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু গণিতে তাঁর মন ছিল না। তিনি যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, তার আগেই ডিরোজিও বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু রিচার্ডসন তাঁর শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে ডি-এল রিচার্ডসন সম্বন্ধে তাঁর ইংরেজিতে লেখা এক স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি ডিরোজিও এবং রিচার্ডসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গেছেন। মন্মথনাথ ঘোষের 'ভোলানাথ চন্দ্র' [প্রথম সংস্করণ ১৩৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬] বইখানির 'পরিশিষ্ট' অংশে সেই ইংরেজি প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

রাজনারায়ণ তাঁর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব, ভোলানাথ, মধুসূদন, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব এবং গোবিন্দচন্দ্র দত্তকে 'প্রধান' বলে উল্লেখ করেন। সেইসূত্রেই—১৮৮৯-এ ভূদেব সম্বন্ধে তিনি লেখেন : 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃত যশের সহিত ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদের কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন।

ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা এবং 'গার্হস্থ্যবিধি' প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন।'

হিন্দু-কলেজের সেই গৌরবের দিনে আরো অনেকের সঙ্গে ভূদেবও তাঁর ভবিষ্যৎ দায়িত্বের জন্যে তৈরি হয়ে উঠছিলেন।[৬]

ভূদেব যখন হিন্দু-কলেজ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়,—তাতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এবং সাধারণ জ্ঞানেও তাঁর ব্যুৎপত্তির প্রশংসা ছিল। এইসব বিদ্যা-অর্জন এবং বন্ধুত্ব-লাভের সমকালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি বড়ো ঘটনা তাঁর মাতৃবিয়োগ ; আর একটি তাঁর বিবাহ। ষোলো বছর বয়সে এলোকেশী দেবীর সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় ঘটে। তখন সেই বালিকাবধূর বয়স ছিল এগারো বছর।

১৮৪৫-৪৬ থেকে ভূদেবের শিক্ষক-জীবন শুরু হয়। ১৮৪৭-এ চন্দননগরে গিয়ে তিনি 'চন্দননগর সেমিনারি' নামে এক ইস্কুল খোলেন। কিন্তু টাকার অভাবে অচিরেই তাঁকে তা ছাড়তে হয়। তারপর কলকাতা

। সেকালের সেই হিন্দুকলেজের কথা আছে মধুসূদনের একটি চতুর্দশপদীতে—

Sonnet

(written at the Hindu College)

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flowers, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !—
Perchance, unmark'd some here are budding now,
Whose temples shall with laureate.wreathe be
crown'd.
Twined by the Sisters Nine : whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages some perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star ;
And, like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality !

মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিয়ে, উত্তরোত্তর সরকারী শিক্ষা-বিভাগের নানা কাজে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৪৯-এ হাবড়ায়,—১৮৫৬তে হুগলী নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হন তিনি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়-পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পর পর সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১২৭১ সালের বৈশাখ থেকে ১২৭৫ সালের মাঘ পর্যন্ত 'শিক্ষা-দর্পণ ও সংবাদসার' [পরে ১২৭৪ সালের পৌষ থেকে এই পত্রিকার নাম রাখা হয় 'শিক্ষা-দর্পণ ও মাসিক পত্রিকা'] নামে একখানি পত্রিকা চালিয়েছিলেন তিনি। আবার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই থেকে ভূদেবেরই প্রস্তাব অনুসারে সরকারী শিক্ষাবিভাগের পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়। দেশীয়দের মধ্যে প্রথমে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা-সম্পাদনায় সহায়ক ছিলেন। অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৬-র মার্চ থেকে ১৮৬৮-র ৩১এ জুলাই পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করেন এবং তারপর পদত্যাগ করেন। তারপর সমুচিত সংবাদ-সমালোচনা ইত্যাদির স্বাধীনতা সম্বন্ধে সরকারকে রাজী করিয়ে, ভূদেব নিজেই সে-পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা ছাপা হ'য়ে বেরোয় ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৬৮তে। সেকালে সেই এডুকেশন গেজেট পত্রিকাতেই হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ইত্যাদি সাহিত্যিকদের অনেক লেখা বেরিয়েছে,—এবং তাতেই ভূদেবের নিজের প্রসিদ্ধ লেখাগুলি প্রথম দেখা দেয়।

১৮৮৩র জুলাই মাসে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে, তিনি কিছুদিন কাশীতে বেদান্ত চর্চা করেন। ১৮৮৮র মাঝামাঝি সময়ে চুঁচুড়ায় ফিরে, পিতার নামে তিনি 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' খোলেন। মৃত্যুর মাস-চারেক আগে, প্রধানত সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্যে এবং দাতব্য চিকিৎসার জন্যে, পিতার নামে এক ধনভাণ্ডার স্থাপন ক'রে, এক লাখ ষাট হাজার টাকা দান ক'রে গেছেন ভূদেব! এই ঘটনার চোদ্দ বছর আগে—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' বেরিয়েছে। লোকান্তরিত পিতার উদ্দেশ্যে সে বইখানির 'উৎসর্গ' অংশে তিনি লেখেন: 'তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু।

আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই।'

এই 'পুষ্পাঞ্জলি'র বিষয়বস্তু বা আলোচনাক্ষেত্রের সংকেত আছে 'গ্রন্থের আভাস' অংশে। পুরাণের রূপক-রীতি অনুসরণ ক'রে হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা আছে। 'উৎসর্গ' অংশে বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকেই পিতার উদ্দেশে তিনি লেখেন—'তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরস্পর সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।'

এই 'পুষ্পাঞ্জলি'র অনেক দিন পরে প্রকাশিত তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভারতবর্ষের কথা-প্রসঙ্গে ভূদেব লেখেন: 'পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ক্রটি হয়।···মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতামাতাও যাহা মনুষ্য-সমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা···'

ভূদেবের আত্মস্থতার মূলে ছিল একদিকে তাঁর এই পিতৃভক্তি,—স্বদেশের অতীতে আস্থা,—এবং সে আস্থা ইয়ং বেঙ্গলের বহুধা-ভাঙনের প্রবল পারিপার্শ্বিকতা সত্ত্বেও কিছুতেই ভাঙেনি; অন্যদিকে তাঁর নিরলস, নিত্য-সজাগ অনুসন্ধান!

রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে তখনকার যুবকসমাজের এবং তখনকার হিন্দু-কলেজের অবস্থা সম্বন্ধে লেখেন—

> "হিন্দু কলেজে যতদিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এইসকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া

জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরার মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।'

১৮৪৯-এ মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন যখন অভিমান প্রকাশ ক'রে গৌরদাসের কাছে চিঠি লেখেন, তার বছর-সাতেক পরে ভূদেবের প্রথম বই 'শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব' [জুন, ১৮৫৬] এবং হয়তো সেই বছরেই তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয়। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'-এর প্রথম ভাগ সম্ভবত ১৮৫৮তে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৯-এ ছাপা হয়। ইতিহাস-প্রসঙ্গ 'পুরাবৃত্ত সার' বেরিয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তার চার বছর পরে তাঁর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' ছাপা হয় [১৫, আগষ্ট ১৮৬২]। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম তিন অধ্যায় অবলম্বনে রচিত ভূদেবের 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' ছাপা হয় সেই ১৮৬২তেই। তারপর ১৮৭৬-এ 'পুষ্পাঞ্জলি,'—১৮৮২তে 'পারিবারিক প্রবন্ধ,'—১৮৯২-এ 'সামাজিক প্রবন্ধ,' —১৮৯৪-এ 'আচার প্রবন্ধ,'—পরের বছর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ', —এবং 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বেরিয়েছিল। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ এবং বিবিধ প্রবন্ধ যখন বেরোয়, নরেন্দ্রনাথের তখন গভীর চিন্তা এবং বিচিত্র ভ্রমণের কাল। তাই সমসাময়িক এইসব বাংলা রচনার কথা মনে পড়ে। হয়তো এসব রচনা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকায় ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ থেকে বেণ্টিঙ্কের পরবর্তী বাঙ্গলার ইতিহাস লিখে গেছেন ভূদেব। সেই লেখারই কিছুটা ছাপা হয় 'এডুকেশন গেজেটে'। তাঁর মৃত্যুর পর 'বাঙ্গলার ইতিহাস' পর্যায়ের তৃতীয়

ভাগ হয়ে সে লেখাগুলি গ্রন্থভুক্ত হয়। আগের দুটি ভাগের প্রথমটি লিখেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বিতীয়টির লেখক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ভূদেবের দিনলিপি ইংরেজিতে লেখা। ১৮৬৭-র ২৪-এ ডিসেম্বর থেকে এই ধারা শুরু হয়। ১৮৭৯তে 'মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা'য় যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়, তার পরেও সুদীর্ঘকাল তিনি বেঁচেছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন সেই ভুল মৃত্যুসংবাদ পড়ে, আসল খবর জানতে চেয়েছিলেন। তাতে ভূদেব যে দুটি গান লেখেন, ব্রজেন্দ্রনাথ সে-দুটিই ছেপে দিয়েছেন। দ্বিতীয় গানটিতে ভূদেবের জীবনদৃষ্টির প্রধান দিকগুলির উল্লেখ আছে—

রটেছে মরণবার্তা ভেবে দেখ্ আজ রে
সংসারে আসিয়া তুই করিলি কি কাজ রে
সেবেছিস গুরুজনে তুষেছিস প্রিয়জনে
পেলেছিস পোষ্যগণে কেমন বিধান রে
ভারতে জনম লাভ তার তরে দুখ ভাবি
করেছিস্ কিবা কাজ মনে মনে গণ রে ॥
জনমভূমির ধার যতন তা সুধিবার
কি করিলি কায় মন বাক্যে তাহা বলরে ॥

এই গানের দিকে চোখ পড়লে উনিশ শতকের বাংলার জ্ঞান-কর্মের উদ্দীপনার উজ্জ্বল, শান্ত ভাবটি মনে আসে। হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। এই জীবন নিয়ে কী করবেন,—বঙ্কিমচন্দ্রও অল্প বয়স থেকেই সে-কথা ভেবে গেছেন। নরেন্দ্রনাথও এই ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার দিকে অকৃত্রিম আগ্রহ,—বেদান্তের দিকে বিশেষ মনোযোগ,—ভারতের শিক্ষা-সমাজ-পরিবার-বন্ধনের কল্যাণ-চিন্তায় তাঁর নিত্যনিষ্ঠা,—এবং ভারতের জাতীয় ঐক্য বা সংহতি চর্চার অন্যতম উপায় হিসেবে একদিকে ইতিহাস পাঠে, অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দী চর্চায় উৎসাহদান—বিবেকানন্দের কথা ভাবতে গেলে,—ভূদেবের জীবন-কাহিনীর এই প্রধান দিকগুলি বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' এই আত্মস্থ ভূদেবের বিশেষ লক্ষ্যবোধের নিদর্শন। 'ভূদেব-চরিতের' তৃতীয়ভাগে ৪৩শ অধ্যায়ে 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য তুলে দেখানো হয়েছে। রাজনারায়ণ

লিখে গেছেন—'ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি এবং সম্মিলনের ও উত্তমের মহামন্ত্রস্বরূপ।'

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী রাজনারায়ণের এই উক্তির পাশেই এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৩ সালের অধিবেশনে সার চার্লস ইলিয়টের প্রদত্ত উক্তিটি তুলে দেখিয়েছেন—'No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have made an equal share'। ভূদেব যে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, প্রগতিতে উৎসাহী একজন আত্মস্থ মানুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে, উনিশ শতকের বঙ্গমনীষার ভাস্বরতা দেখিয়ে গেছেন। দেশের ঐতিহ্যকেই তিনি তাঁর পিতা ব'লে মানেন,—আর দেশের আকাশ, বাতাস ইত্যাদি সর্ব-ব্যাপারের সামগ্রিক মূর্তিটিকেই তিনি জননী-সম্বোধনে চিহ্নিত ক'রে গেছেন। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' অধিকারী-ভেদ ও স্বদেশানুরাগ' নামে একটি নিবন্ধে সেই মাতৃমূর্তির উল্লেখ আছে। সেই উক্তি দিয়েই ভূদেবের আত্মস্থতার প্রসঙ্গ সুচিহ্নিত করা যেতে পারে—

> 'যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে হিন্দু জাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদয় 'মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী-দেহ'।'

সাহিত্য ও সমাজ কথায় বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁর বাংলা লেখাগুলিতে সাহিত্য-গুণ আছে বটে, তবে প্রধানত সাহিত্যস্রষ্টা হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তবে, সাহিত্যপাঠক হিসেবে তাঁর পরিচয় অশ্রুতপূর্ব নয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যু থেকে শুরু করে তাঁর আমেরিকা যাত্রা পর্যন্ত যে সময়বিস্তার, তার মধ্যে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর সেই পরিব্রাজক-জীবনের কথা-প্রসঙ্গে হরিপদ মিত্রের আলোচনায় দেখা যায় ডিকেন্সের 'পিক্‌উইক্ পেপার্স' থেকে তিনি একবার কয়েক পৃষ্ঠা মুখস্থ শুনিয়েছিলেন। তাছাড়া জুলে ভার্নের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস এবং কার্লাইলের 'সার্টর রিসার্টস্'ও তিনি হরিপদ মিত্রকে পড়িয়েছিলেন। দর্শন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, ভক্তিমূলক গান ইত্যাদি রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল স্বভাবগত। কিন্তু এসব ছাড়াও নানা শ্রেণীর সাহিত্যে তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তারও কিছু কিছু নজীর আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারি এবং ১লা ফেব্রুয়ারি ক্যালি-ফোনিয়ার প্যাসাডেনাতে শেক্সপীয়র-সভায় তিনি যথাক্রমে ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত দুটি বক্তৃতা দেন। রাম-প্রসাদের গান তিনি কথায় কথায় স্মরণ ক'রতেন। উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধ-সাহিত্য তেমনি তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। তুলসীদাসের দোঁহা তাঁর বিভিন্ন রচনার অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। তাঁর অজস্র ইংরেজি লেখার মধ্যেও সাহিত্যগুণ এবং নানা সাহিত্যের উল্লেখ—দুইই বিদ্যমান।

সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁকে ঠিক প্রধানত সমাজচিন্তানিষ্ঠ মানুষ বলে চিহ্নিত করা চলে কি না জানিনা। তিনি লোক-কল্যাণের দিকটি খুবই ভেবেছেন বটে, কিন্তু রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যেরকম, তিনি ঠিক সেরকম ছিলেন না। নিজেকে 'রামকৃষ্ণের দাস' বলে তিনি সমাজের কাজে নামেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ ক'রে একটি স্থায়ী সন্ন্যাসী-সমাজ গড়বার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ২৬এ মে, ১৮৯০ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর এই সংকল্পের কথা ছিল। সে চিঠি আগেই স্মরণ করা গেছে।

বিবেকানন্দের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার মুখবন্ধেই তাই এই কথাটি মেনে নেওয়া সংগত যে, একজন আবেগধর্মী অথচ যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানীর সত্যোপলব্ধিই তাঁর সাহিত্যের মূল কথা। তাঁর ইংরেজি বাংলা দু'রকম লেখাতেই এই পরিচয় বিদ্যমান। যদি কেবলমাত্র তাঁর বাংলা রচনার ক্ষেত্রেই দৃষ্টি সীমিত রাখা যায়, তাহলেও এই সত্যটি মানতে বাধা হবে কেন?

তিনি যেকালে এইসব রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তার অনেকদিন আগে থেকেই এদেশে ধর্মাচার ও ধর্মানুভূতি সম্বন্ধে ইংরেজিতে এবং বাংলায় বিভিন্ন রচনার চর্চা শুরু হয়েছে। রামমোহন খ্রীষ্টান মিশনারী এবং গোঁড়া হিন্দু,—দু'দলেরই বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের লেখকরা আক্রমণে এবং আত্মরক্ষায় সমান নিপুণ ছিলেন। ইংরেজিতে ভারত-ঐতিহ্য সম্বন্ধে মতামত প্রচারের গুরু দায়িত্ব পালন ক'রে গেছেন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী। বিবেকানন্দও এই ধারাতেই লক্ষণীয়। তাঁর সাহিত্য তাই কর্মচাঞ্চল্যহীন শান্ত কোনো আবেষ্টনীর মধ্যে অনুশীলিত ললিতকলা মাত্র নয়। প্রধানত ধর্মানুভূতিই ছিল এই সাহিত্যের প্রেরণা।

লোককল্যাণের চিন্তা ছিল তাঁর এই ধর্মানুভূতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অনুভূতিকে সমুচিত যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে মননগুণ থাকা দরকার, তিনি ছিলেন সেইগুণের সহজ অধিকারী। তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে মিশেছিল প্রচারের জোর। সে তাঁর ব্যক্তিত্বেরই জোর।

তাঁর এই ব্যক্তিত্বই সর্বাধিক স্বীকার্য। এখানে সংক্ষেপে তাঁর নিজস্ব কয়েকটি মতামত উল্লেখ ক'রলে এই ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিটি কতকটা বোঝা যাবে।

প্যারিস থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরের এক চিঠিতে বিবেকানন্দ ইংরেজিতে যা জানিয়েছিলেন, তার বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—

> 'আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের তেমনি আমি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না।'

১৮৯৬-এর ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে ফ্রান্সিস লেগেটকে তিনি লেখেন—

> 'আমি এতদিনে দু'একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে,

"ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ"—এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে অনেক দূরে। ওহে সাকি' পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেম-মদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই।'

১৮৯৭-এর ৯ই জুলাই মেরী হেলকে আলমোড়া থেকে তিনি লেখেন—

'আমি কখনও কোন জিনিস মতলব করে করিনি। আপনা-আপনি যেমন সুযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব মস্তিষ্কের ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জন-সাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি···

'আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ দৃঢ়ভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চিত বুঝব যে, লোককল্যাণকল্পে অন্তত ভারতে এমন একটা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমুবো।'

গাজিপুরের পওহারী বাবা তাঁকে বলেছিলেন—'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' 'যখন তুমি কোন কার্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজারূপে—সর্বোচ্চ পূজারূপে উহার অনুষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতেই সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ কর।' তিনি তাই-ই করেছিলেন। বিবেকানন্দের সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সমাজ-চিন্তা দুইই তাঁর সমগ্র জীবনের এই ঐকান্তিক সাধনারই অঙ্গ।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দুটি বক্তৃতা তুলনা ক'রে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরীতিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দিকটি দেখিয়েছেন।[১] তাঁর বিশেষ বিশেষ উপমা ব্যবহারের এবং বিশেষ ভঙ্গির কথা-প্রসঙ্গে জেরিমি টেলরের রীতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য উল্লেখ করে প্রবন্ধের শেষ ছত্রে শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন যে তাঁর ইংরেজি রচনার রীতিগত সাদৃশ্যের কথা ভাবা যেতে পারে একমাত্র কার্ডিন্যাল

১। 'Swami Vivekananda as a speaker and writer of English', 'বিশ্ববিবেক' পৃঃ ৪৩৮-৪৫১ দ্রষ্টব্য।

নিউম্যানের সঙ্গে। বিবেকানন্দ অথবা নিউম্যান—এঁরা কেউই ঠিক প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু গভীর ভগবদ্ভক্তির তাড়নায় এঁরা আবেগ এবং বুদ্ধি—দুইয়েরই পরমাশ্চর্য সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন নিজের নিজের রচনায়।

ইতিপূর্বে যেমন অন্যান্য কয়েকজনের কথা দেখা গেল, বিবেকানন্দের সাহিত্যও তেমনি শতাব্দীর বিশেষ ধারারই ঢেউ। তাঁর লেখাগুলি বাংলার নিজস্ব চিন্তাধারায় স্থাপন ক'রে দেখতে গেলে রামমোহন থেকে সূচিত সেই বিশেষ ধারার কথাই মনে পড়ে। এই ধারায় যেমন ভূদেবের প্রসঙ্গ স্মরণ করা গেছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তাও স্মরণীয়।

উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজ-সমাজের অতিপ্রভাবের দিকটি ছিল ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কিত রচনাবলীতে জাতীয় ভাবের যে আলোচনা দেখা যায়, সেই বিশ্লেষণের সঙ্গে ভূদেবের এই বক্তব্যের সাদৃশ্য আছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের ফলেই ভারত-ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাবোধ সমুচিত উৎসাহিত হচ্ছে না—এই ছিল ভূদেবের বক্তব্য। তিনি এই আলোচনার এক জায়গায় লেখেন—

> 'ইংরাজী শিক্ষার বিষ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে।'

ভূদেব আর একটি উপায়েরও উল্লেখ করেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে আমরা বিজ্ঞান-সম্পর্কিত উপকরণগুলি ইংরেজের কাছেই পেয়েছি, এবং সেই কারণেও ইংরেজের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি দেখা দিয়েছে। তাই—

> 'আমরা যদি…ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্ত্রাদির নির্মাণ-কৌশল এবং প্রয়োগ-বিধান শিখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা অযথা ভক্তির হ্রাস হয়।'

এই ভক্তি যে 'অযথা',—সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। তিনি লেখেন—

> 'মনুষ্যের দুইটি কর্ম আছে—বাহ্য জগৎকে জয় করা আর

অন্তর্জগৎকে জয় করা ; সে দুইটি কার্যের মধ্যে যাহা ইংরাজেরা করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্য জগতের উপর কতকটা প্রাধান্য লাভ, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্রকৃত তথ্যের জ্ঞানোদয় হইলেই আর ইংরাজের অনুকরণেচ্ছা অতি প্রবলা হইতে পারে না, ইংরাজ আর আদর্শস্থলীয় থাকে না এবং তাহার রীতি চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগসুখেচ্ছা বর্ধিত হইয়া জনগণকে স্বার্থপর করিয়া তুলে না।'

এই শাস্ত্র মননই ভূদেবের প্রধান দিক। তথ্য-দৃষ্টির দিক থেকে ভূদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাদৃশ্যের দিকটি সহজে স্বীকার্য। কিন্তু বিবেকানন্দের উপলব্ধি নিঃসন্দেহে গভীরতর সামর্থ্যের ইঙ্গিতবাহী। সেদিক থেকে বরং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর নিকটতর যোগ অনুভব করা যায়, যদিও লেখক হিসেবে আবার রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ভিন্নধর্মী। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও বিবেকানন্দের চিন্তার মিল দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। এঁদের রচনারীতি একরকম নয়,—প্রকাশের ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন,—কিন্তু আবেগে বিশ্বাসে এঁদের পরস্পরের মধ্যে মিল যে ছিলই, সে-কথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার তুলনায় মনে হয় এ-কথা ঠিকই যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক পথের পথিক, বিবেকানন্দ অন্য পথের। তবু এদেশের ভাব-সাধনার ধারায় এঁদের মিলের দিকটিই বিবেচ্য। পরিপূর্ণ কর্মযোগের সঙ্গে পরিপূর্ণ বৈরাগ্যে বিশ্বাস ছিল দুজনেরই মনোধর্মের মূল কথা। বিশ্বমানবের কল্যাণই ছিল দুজনের সাধনা।

লোকশ্রেয়ের জন্য কর্মযোগ

বিবেকানন্দের আদর্শের কথা তাঁর নিজের নানা রচনায় এবং বিভিন্ন বন্ধু ও শিষ্যের মন্তব্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

সূত্রে যেমন মণিহারের মণি, মানব-সমাজের বিভিন্ন জ্ঞান, জগৎ-ব্যাপারের অশেষ বিচিত্রতাও তেমনি। সব ধর্মই সত্য। আধুনিক যুগে জগতে জাতিতে-জাতিতে আদর্শ-বিনিময়ের সময় এসেছে। এই ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বাস। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা এসব। তার আগের পর্বে, ১৮৮৬তে পরমহংসদেবের

লোকান্তর-প্রাপ্তির সময় থেকে ১৮৯৩-এ শিকাগো-যাত্রা অবধি নানা ভ্রমণ ও বহুল অধ্যয়নের পথেও এই উপলব্ধিই তিনি পেয়েছেন। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁর নানা বক্তৃতায় তিনি এই ভাবটি প্রকাশ করেন। ১৮৯৬-এর জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর কেটেছে সেভিয়ার-দম্পতি আর কুমারী মুলারের সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণে। ডিসেম্বরে কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে রোম হয়ে তাঁকে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হ'তে দেখা যায়। ১৮৯৭-এর ১৫ই জানুয়ারি তিনি কলম্বো পৌঁছেছিলেন। নিবেদিতা ভারতে আসেন আরো পরে,—২৮এ জানুয়ারি, ১৮৯৮।

নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মধ্যে তিনটি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। প্রথম, ইংরেজি আর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার, দ্বিতীয়, গুরু রামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধায় অলৌকিক মহিমাময় তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ; তৃতীয়, ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ, সানুরাগ তথ্যজ্ঞান।

সকলেই জানেন, নরেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ জিগেস করেছিলেন, 'তোর জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ কী ?' উত্তরে তিনি বলেন—'সর্বদা সমাধিস্থ থাকা'! কিন্তু গুরুর ইচ্ছায় আর বিধাতার বিধানে ইহজীবনে লোকশ্রেয়ের জন্যেই নিত্য সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকতে হয় তাঁকে।

সংসারে নিয়ত ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানুষের সংকীর্ণ আমিত্ববোধ অনেকটা বশীভূত থাকে। সকল অবস্থায়, সকলের পক্ষেই কর্ম শ্রেয় ; কর্ম ব্যতিরেকে মুক্তি দুর্লভ.—এই হোলো কর্মযোগের আদর্শ। বিবেকানন্দের সাধনা আর সিদ্ধি এই নিত্য ঈশ্বরচিন্তাময় অখণ্ড কর্মপরায়ণতায়। দেহবুদ্ধির একান্ত অভাবই যথার্থ সাধুর লক্ষণ। সেই অর্থে, তিনি ছিলেন সাধুশিরোমণি। সাধু-সজ্জনেরা সংসারের মায়া সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হওয়াই কর্তব্য। এরই নাম 'কর্মযোগ'—ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত কর্ম। বিবেকানন্দ লণ্ডনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আমরা যে সামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও সেই পরিমাণে দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘদীন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।'

এ তাঁর ইংরেজি উক্তির হুবহু বঙ্গানুবাদ।

মানুষের মনে আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বোধও যেমন জাগে, দুঃখ অনুভব করার সম্ভাবনাও তেমনি বেড়ে যায়! আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের এই অনুভববৃদ্ধিও মায়া। বেদান্ত এই সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল, আশা-নৈরাশ্যের মিশ্র পরিব্যাপ্তিকে মেনে নিয়েছে। অতএব সুখ-সন্ধান নয়, কর্মনিযুক্তিই বেদান্তের নির্দেশ! কর্মই যথার্থ বৈরাগীর সাধনা। বিবেকানন্দ বলে গেছেন—'বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা'। বিষ্ণুপুরাণ থেকে তিনি শ্লোক শুনিয়ে গেছেন তাঁর লণ্ডনের শ্রোতৃমণ্ডলীকে। তার সরল বঙ্গানুবাদ এই রকম—আগুনে ঘি পড়লে আগুন যেমন বেড়েই যায়, কামনার আগুনে বাসনার বস্তু ধরা দিলে কামনা তেমনি আরো উদ্দীপিত হয়।

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন, পরা বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? মানুষের সামর্থ্য তো তার মর্ত্য মন আর কয়েকটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত! সেক্ষেত্রে অনন্তকে জানবার চেষ্টা অসার অহমিকা মাত্র মনে হওয়া কি অস্বাভাবিক?

এই সব তর্ক-জিজ্ঞাসার সূত্রে বিবেকানন্দ বলে গেছেন, স্পেন্সার প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদী বিদ্বজ্জনের এই ধরনের কথায় ভুললে চলবে না। কারণ, 'জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের—পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন।' বলা-বাহুল্য, মানুষের এই স্বভাবও জগৎ-স্বভাব। এও মায়া! তিনি 'মায়া' ত্যাগ করতে বলে গেছেন।

পশু-মানব আর আধ্যাত্মিক-মানব,—মানুষের এই দুই সত্তার মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছে। সাহিত্যে যেমন 'সুমতি' আর 'কুমতির' কলহ, জীবনে সেই রকম 'প্রেয়' আর 'শ্রেয়ের' দ্বন্দ্ব। সুদূর অতীত থেকে শুরু ক'রে নিকটতম বর্তমান পর্যন্ত প্রবাহিত চৈতন্যের এক অনবচ্ছিন্ন ধারাতে আমরা জেগে

আছি। অতীতকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বর্তমানকে মানা চলে না। অতীতের বহু দুঃখের অভিজ্ঞতা বাতিল ক'রে দিয়ে, স্মৃতিকে উপেক্ষা ক'রে, শুধু এই আপাতজ্ঞাত বর্তমান জগৎকেই চূড়ান্ত বলা সাজে না। সে দৃষ্টি শূন্যবাদীর দৃষ্টি। তিনি তা মানেন নি। মানুষ মৃত্যু-ভাবনা বাদ দিয়ে চলতে পারে না। নিশ্চয়বাদী কোম্‌ৎ প্রভৃতি ভেবেছিলেন যে, মানুষের মননশক্তি সম্পূর্ণভাবে তার দেহ-যন্ত্রেরই দান। কিন্তু বিবেকানন্দ হিন্দু দর্শনের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে জানিয়ে গেছেন যে, এক অখণ্ড, অনন্ত আত্মাই জ্যোতির্ময় মনোদেহ অবলম্বন ক'রে আমাদের স্থুল শরীরের গঠন-পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন। আত্মার আকৃতি নেই। আত্মা দেশ-কালে সীমিতও নন, দেশ-কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নন! অতএব, দেহী যখন দেহাভিমান ত্যাগ ক'রে নিজেকে স্বাধীন, বিমুক্ত ও সর্বান্বিত 'এক' রূপে দেখলেন, তখনই, যথার্থ আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয়েছে বলা চলে। আত্মজ্ঞানীর কাছে এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ শুদ্ধস্বরূপ! সত্য অকুতোভয়! সত্যই পথ, সত্যই লক্ষ্য, সত্যই সাধনা!

১৮৮৬তে রামকৃষ্ণঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক মাস মাত্র আগে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে জিগেস করেন,—'তোমার ত শরীর দিন কতক পরেই যাবে, আমায় কি করে দেবে দাও।' রামকৃষ্ণ বলেন, 'ওরে, আমি মরছি, এই সময়ে তোর যত উৎপাত।' কিন্তু শিষ্যের ব্যাকুলতার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তিনি শক্তি সঞ্চারিত করেন।

গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, নরেন্দ্রনাথ তখন অনেক তর্ক করেছেন। সেই কাশীপুর থেকেই কালী আর তারকনাথের সঙ্গে নরেন্দ্র গয়ায় যান। কাশীপুরে বাইবেল পড়তে পড়তে সেন্ট জনের সুসমাচার থেকে ইহুদি-শাসক নিকোডিমাসের যীশু-অনুরাগের কাহিনীটি তাঁর মনে গাঁথা হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস তখন তো অচিরেই দেহত্যাগ করবেন। তারপর? রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কর্মসাধনায় আরো বলসঞ্চার দরকার! যীশুকে যখন সমাধিস্থ করা হয়, তখন নিকোডিমাস এসে সেই শরীরে গন্ধদ্রব্য অঞ্জলি দেন। এই পুরাবর্ণনা নরেন্দ্রনাথ সেই পর্বের প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধকালে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বুদ্ধ, যীশু, আর শঙ্করাচার্য, এই তিন সাধকের জীবন-সাধনা ছিল গভীর আবেশের বিষয়।

তখন তাঁর কাকা তারকনাথ দত্তের মৃত্যুকাল আসন্ন। হাইকোর্টে মামলা চলছে। সেই সময়ে, মহেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে একদিন এক থার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে সিমুলিয়ার বাড়িতে চলেছেন। কালী বেদান্তীকে শঙ্করাচার্যের স্তূত্র শোনাতে শোনাতে নরেন্দ্রনাথ বিভোর! 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্'—এই কথা বলতে বলতে নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে! মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ভাবটা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে; ইহা গাত্রে যেন স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে নাদ-ধ্বনি।··· নরেন্দ্রনাথ বিভোর, মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছে, যেন ঘাড় মাথাকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চক্ষু কখন নিমীলিত, কখন বিস্ফারিত, ···কিন্তু সকল পরিবর্তনের ভিতর এক গম্ভীর মহা আকর্ষণী ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, একটা মহাভাবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞাহীন। জোর করিয়া যেন মনটা ফের দেহের ভিতর নামাইয়া আনিতেছে।'

১৮৯৬-এর ২৯এ অক্টোবর লণ্ডনের এক বক্তৃতায় কঠোপনিষদ থেকে যম-নচিকেতা কাহিনী আলোচনার সময়ে বিবেকানন্দ ইঙ্গিত করেন যে, সংসারে ব্যবহারিক জগৎ-পরিবেশেই মন আচ্ছন্ন থাকে। মন প্রস্তুত না হলে ধর্মের কথা কানে ঢুকলেও মনে ঢোকে না। ধর্মবোধ তর্ক নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়। কাশীপুরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মন যেমন বিভোর ছিল, দশ বছর পরে লণ্ডনেও নরেন্দ্রনাথের মন সেই রকমই ব্যাকুল, প্রত্যক্ষজ্ঞানী, অধ্যাত্ম-চিন্তাময় ছিল!

১৮৯৬- এর এপ্রিল-মে মাসে তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে যান। তার কিছুদিন আগেই, মার্চের শেষে বা এপ্রিলের প্রথমে সারদানন্দ লণ্ডনে যান এবং শিবানন্দের বন্ধু, আগে থিওজফিক-সম্প্রদায়ভুক্ত,—পরে, আলমোড়ায় যোগাভ্যাস-অভিজ্ঞ ই. এফ. স্টার্ডি তাঁকে রেডিং শহরে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। এই স্টার্ডির সঙ্গে আগে থেকেই বিবেকানন্দের পত্রালাপ ছিল! সে-সময়ে জে, জে. গুডইইন নামে এক ইংরেজ যুবক বিবেকানন্দের কথাবার্তা, বক্তৃতা ইত্যাদি সংকেত-লিপিতে লিখে রাখবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যে সকল ইংরাজি গ্রন্থ বক্তৃতারূপে স্বামীজীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তই গুডউইনের পরিশ্রমের ফল।' গুডউইনের

অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই এ তথ্য জানা যায়। গুডউইন বাস করতেন বাথ নগরের সন্নিহিত ফ্রোম গ্রামে। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে গুডউইনের সঙ্গে আসেন। তিনি নানা কারণে মাদ্রাজ প্রদেশে চলিয়া গেলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল অবসর পাইলে তাঁহার করচা হইতে প্রচলিত লিপি করিয়া স্বামীজীর কথোপকথন ও ভাষণের অংশ প্রকাশ করিবেন। সেই সকল বিষয় প্রচলিত লিপিতে লিখিত হইলে প্রায় সাত খণ্ড গ্রন্থ হইত। নানা কারণে তাহা হয় নাই এবং গুডউইনও মাদ্রাজ প্রদেশে দেহত্যাগ করেন। মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা প্রভৃতি স্বামীজীর কয়েকজন ভক্ত গুডউইনের দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র তাঁহার মাতার নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ক্ষিপ্রলিপির কিছু বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন।'

গুডউইনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই নিবেদিতা ইংলণ্ডে যান। মহেন্দ্রনাথ তাঁকে গুডউইনের মায়ের ঠিকানা দিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন; কিন্তু নিবেদিতা ফিরে এসে জানান যে, গুডউইনের মা এবং দুটি বোন—সকলেই অন্য কোথায় চলে গেছেন। এইভাবে গুডউইনের লেখা হারিয়ে যায়। মহেন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন—'স্বামীজী যখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতেন, তখন নার্সের পরিচ্ছদে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীজীর দিবাভাগের বক্তৃতাসমূহ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিয়া লইতেন। তিনি আমাদের সহিত কখনও মেশেন না বা আমরা কেহ তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না; তাঁহার কাছে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা পাওয়া দুরাশার বিষয়।'

এইসব কাগজপত্র নিরুদ্দেশ হয়েছিল বলেই মহেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইখানি লিখে গেছেন। ১৩৩৮ সালের রাসপূর্ণিমা তিথিতে লেখা তাঁর সে বইখানির ভূমিকায় দেখা যায়—'গুডউইনের লিখিত কাগজের সহিত এই গ্রন্থ তুলনা করিলে হিমালয় পর্বতের সহিত বালুকণার যে সম্বন্ধ ইহা তদ্রূপ হইবে।'

সারদানন্দের বিলেত-যাত্রার সপ্তাহকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান। বিবেকানন্দ তাঁকে আইন পড়তে নিষেধ করেছিলেন। তাই সেখানে তাঁর অন্য বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু হয়।

লণ্ডনে বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, জে. জে. গুডউইন ইত্যাদি সকলেই

অল্পদিনের মধ্যে অন্য একটি বাড়িতে উঠে যান। সে বাড়িটি লেডি মার্গ্যসনের। স্টার্ডি সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের চেহারা তখন এতোই বদলে গিয়েছিল যে চীপসাইডের এক চৌমাথার কোণে সারদানন্দ আর গুডউইনের সঙ্গে তাঁকে একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ চিনতে পারেন নি। কারণ,— 'কলিকাতা বা বাংলা দেশে যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে লোক আর তখন নয়, তিনি স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হইয়াছেন। গায়ের বর্ণ অনেকটা উজ্জ্বল বা যাহাকে ইংরাজিতে fair brown বলা যায়, শুধু white নয়। মাথায় যদিও অর্ধচন্দ্রাকৃতি লখনউর তাজের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি ছিল, কিন্তু মাথার সম্মুখেতে সিঁথি-কাটা দেখা যাইতেছিল। পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্ট্ এবং গলায় কলার ছিল, কিন্তু টাই ছিল না। চক্ষুদ্বয়, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত, চক্ষুর পাতার নিম্নস্থল স্ফীত এবং অক্ষিপুট সাধারণ লোকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুদীর্ঘ ও বিস্ফারিত এবং নেত্র হইতে মহাতেজ ও আকর্ষণী শক্তি বাহির হইতেছে। চক্ষুদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ এবং শব্দস্রোত বহুদূরগামী।'

এই সাক্ষাতের পরদিন, কৃষ্ণমেনন নামে এক মাদ্রাজী যুবকের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ ৫৭ নং সেণ্ট জর্জ স্ট্রীটের বাড়িতে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। সেই বাড়িতে বিবেকানন্দ তাঁকে একটি নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের তখনকার যা কিছু চিন্তা সবই 'পড়া পুঁথির' মতন বলে দেন! সেই কাজটুকুর পরেই আবার তাঁরা নিচের বৈঠকখানায় ফিরে আসেন এবং সাধারণভাবে আগেকার নরেন্দ্রনাথ হয়েই হাসিতামাসা করেন। এই সময়েই মহেন্দ্রনাথের মনে হয় যে—'পূর্বতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়, পূর্বদেহে বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখন বা কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ বাস করেন কখন বা বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ বাস করেন।' বিবেকানন্দের মনের ভাব তখন স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত ; তাঁর গলার স্বর তখন 'দ্বন্দ্বাতীত আজ্ঞাপ্রদ'!

এই এক ছবি,—আর, কাশীপুর থেকে শিমুলিয়ার পথে থার্ডক্লাস ঘোড়ার

গাড়িতে 'শিবোঽহং' নাদ-আস্বাদনের জন্য যে বিভোরতার ছবি একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই দুটি ছবিরই ইঙ্গিত এই যে, লৌকিক কামনা-বাসনার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না তিনি, সেই গণ্ডীর বাইরে যাবার সাধনায় মগ্ন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই তিনি অনন্যসাধারণ! তাঁর মন্ত্র—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'। অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' নয়,—বলো 'তুমি' তুমি'! আমিত্বই মায়া, তুমি-বোধই ত্যাগের জনক। 'ত্যাগ' মানে কর্মত্যাগ নয়, দুঃখমগ্নতা নয়, অবসাদ নয়। তাঁর ইংরেজি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদে তাঁর এই কথাও দেখা গেছে—'যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব; তখন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা—অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।'

'ইহারই নাম ত্যাগ।'

রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ: 'একটি পুরাতন কথা'

ত্যাগের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও বারবার আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যের ভঙ্গি বা কলাকৌশলের দিক থেকে এঁদের পার্থক্য সুপরিচিত, কিন্তু এই ত্যাগের কথা দুজনেই পুনঃ পুনঃ লিখেছেন। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের বছর-দুয়েক আগে ১২৯১-এর অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সে লেখাটির নাম 'একটি পুরাতন কথা'। তাতে তিনি 'অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতি'র কথা তোলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ বছর, নরেন্দ্রনাথের একুশ। সমসাময়িক এই দুই মনীষীর মধ্যে ধর্মচিন্তায় কে কার অগ্রণী, সে-কথা অবান্তর। উনিশ শতকে এদেশে যে ব্যাপক চিত্ত-জাগৃতি ঘটেছিল, তার অব্যবহিত কারণগুলির মধ্যে দেশে উত্তরোত্তর ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ বা সম্পর্কের ফলে আমাদের স্বজাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার ক্রমবিস্তার যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। নরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার যে-দিকটি বৃহৎ মানব-সমাজের বাস্তব সুখদুঃখ-চিন্তার সঙ্গে জড়িত,—জন-কল্যাণের দিকে তাঁর সেই সদাজাগ্রত আগ্রহ শুধু তাঁর নিজেরই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; তাঁর সাধনার বিশেষ ক্ষেত্রটিকে এদেশের বৃহৎ ইতিহাসের ধারায় স্থাপন ক'রে দেখলে তবেই তাঁর সে-আগ্রহের সার্থকতা অনুভব করা

সম্ভব। রামমোহন থেকে শুরু ক'রে সারা উনিশ শতকের বিস্তারে এবং তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন এই একটি ধারা বয়ে গেছে।

জীবন-সাধনার পর্বে পর্বে নির্ভয়ের মন্ত্রই ছিল বিবেকানন্দের প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই অভয়-মন্ত্রের সাধক। ১৩০০ সালে, অর্থাৎ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের কাছাকাছি সময়ে 'ইংরাজের আতঙ্ক' নামে[১] তাঁর যে প্রবন্ধটি লেখা হয়, তাতে ইংরেজ সরকারের পক্ষে এদেশের সাঁওতাল-ভীতি (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ), কংগ্রেস ভীতি, এমন কি গোরক্ষণী-সভা-ভীতি সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি প্রকাশিত হয়। ১৩০১-এর রচনা 'রাজা ও প্রজা'-র উপসংহারে তিনি আমাদের যথার্থ আত্মরক্ষার উপায়টিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন—'কোনো যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না; তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'সমস্ত ভালো কথার ন্যায় এ-কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অতি পুরাতন।' এই স্থূল সংসারে, আমাদের ব্যক্তিমন আর সমাজমন,—ব্যক্তিমনের অর্থ-পরমার্থবোধ এবং সমাজচিত্তের শুভাশুভবোধ—এ দুয়ের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা মনে রেখে সেই ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> 'বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত, তবে তাহা দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে, তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ-শক্তির আবশ্যক—একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে, কিন্তু পৃথিবী-বেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে, এইজন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশ্যক।'[২]

ব্যক্তিনিরপেক্ষ বৃহৎ ন্যায়াদর্শের ঔচিত্যের দিকেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মতন বিবেকানন্দেরও নজর পড়েছিল। এইরকম বৃহৎ কোনো ধর্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এদেশের শীর্ষবর্তী মনে তখন একই চিন্তার ঢেউ দেখা দেয়। কবি, ধর্মসাধক, রাজনীতিক্ষেত্রের ভাবনেতা, সমাজসমস্যার

১। সমূহ (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র-রচনাবলী [বিশ্বভারতী] ১০ম খণ্ড।

২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩ দ্রষ্টব্য।

সমাধানব্রতী—সে-সময়ে যিনি যে-পথ দিয়েই এসে থাকুন, সব সত্যার্থীকেই এদিকে কতকটা একই কথা বলতে হয়েছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—মানুষের জীবনে এই তিনের সর্বোদয় চেয়েছিলেন তাঁরা। লোককল্যাণের অভিমুখী ভক্তিসাধনাতেই তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিবেকানন্দ নিজে খ্রীষ্টধর্মে ভক্তিভাবের তারিফ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে রবীন্দ্রনাথের 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তিকা (১৩০৮) প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়—

> 'ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্যসকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের এইরূপ মহত্ত্ব সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন।[৩]

বাংলায় উপনিষদ্ ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার কিছু আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' ছাপা হয়।

১২৯১-৯২ সালে, অর্থাৎ পরমহংসদেবের আয়ুষ্কালের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর-রীতি অবলম্বন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই আলোচনায় বলেন, 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম—'The substance of religion is culture.'। তাঁর মতে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চেষ্টাই যথার্থ ধার্মিকের চেষ্টা। তিনি বেদান্তের কথাও তোলেন, আবার খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরোপাসনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। তাঁর এই ধর্মতত্ত্বে গুরু বলেন—

> 'ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক্ ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না; কেন না যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' চৈতন্য, অথবা যাঁহাকে হর্বট স্পেনসার 'Inscrutable Power in Nature' বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল

৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টীয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন-না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে 'Impersonal God' বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে 'Personal God' বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।'

উনিশ শতকের বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনন-ক্ষেত্রে এই বেদান্ত-কথা আর সগুণ ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ,—এই দুয়ের অদ্ভুত এক অন্বয়বোধ দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দের শিষ্যদের মধ্যে তাঁর নানা কথা যাঁরা চয়ন ক'রে গেছেন, তাঁদের সেইসব সংগ্রহের মধ্যে স্বামীজীর 'জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালার' নবম খণ্ডে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর চয়নে দেখা যায়, স্বামীজী বলে গেছেন—কর্ম মানে জীবসেবা, সেবায় সকলের অধিকার। আবার বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট আদর ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি বিচারের চেয়েও বড়ো জিনিস আছে।[৪]

প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে ভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামীজী বলেন যে, ব্যাপকভাবে নতুন ভাবগ্রহণের ঔৎসুক্য জগতে আমেরিকার মতো দ্বিতীয় আর কোনো জাতির নেই। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের কথা ওঠে। ইংরেজরা রক্ষণশীল। কিন্তু স্বামীজীর মতে তাঁরা একবার যখন যথার্থই নতুন কোনো ভাবের মূল্য বোঝেন, তখন তা আর সহজে ছাড়েন না। অতএব ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারের চেষ্টা স্থায়ী হবার বেশি সম্ভাবনা—এই ছিল তাঁর নিজের বিশ্বাস। সার্বভৌম বেদান্তবাদে সব মতের—সব পথেরই সমান অধিকার। এ মত ভারতবর্ষ থেকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ভারত-সংস্কৃতির যথার্থ সমাদর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। বিবেকানন্দের এ-ধারণা তাঁরই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সেই একই কালে প্রায় একই উপলব্ধি জানিয়ে গেছেন এবং বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণও অদ্বৈত-পন্থাকেই 'শেষ কথা' বলেছেন। রাষ্ট্রতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে—উভয় ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মবোধই ছিল বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়েরই চিন্তার ভিত্তিমূলে।

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৩৬৯), নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য।

শিকাগো-ভাষণের বছর-তিনেক পরের কথা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তিনি নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন যাত্রা করেন। তখন লণ্ডনে স্বামীজীর ভক্ত স্টার্ডির বাড়িতে স্বামী সারদানন্দ বাস ক'রছেন। মাত্র দিন পনেরো আগে তিনি কলকাতা থেকে লণ্ডনে পৌছেছেন। এদিকে বিবেকানন্দ লণ্ডনে এসে কুমারী মুলারের অতিথি হিসেবে সারদানন্দের সঙ্গে সেণ্টজর্জ-রোডের বাড়িতে ওঠেন। ধর্মজিজ্ঞাসু নানা মানুষের ভিড়ে তিনি তখন পরিবৃত থাকতেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ওদেশে যেন প্রশ্নের অন্ত ছিল না। এই ১৮৯৬-এর মে মাসের শুরু থেকেই জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা শুরু হয়। মে মাসের শেষ দিকে পিকাডিলিতে তিনি তাঁর রবিবাসরীয় ভাষণ শুরু করেন। 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা,' 'সার্বভৌম ধর্মমত' এবং 'আসল ও আপাতদৃশ্য মানবসত্তা'—এই তিনটি বক্তৃতার সাফল্য দেখে জুন থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তাঁকে আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়। তারপর 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' এবং 'উপলব্ধি'—পরপর এই তিনটি বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন তিনি। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে তিনি তখন ধর্মশাস্ত্রপাঠের পাঁচটি ক্লাস নিতেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর-সভায় এসে বসতেন তিনি।

এই সময় অ্যানি বেসাণ্টের নিমন্ত্রণে তাঁর অ্যাভিনিউ রোডের বাড়িতে যান বিবেকানন্দ। সেখানে 'ভক্তি' সম্বন্ধে,—শ্রীমতী মার্টিনের বাড়িতে আত্মা-সম্পর্কিত হিন্দু আদর্শ সম্বন্ধে, তাছাড়া নটিং-হিল্ গেট-এর বাড়িতেও অন্যান্য আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা চলে। তখনকার 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় সারদানন্দের লেখা থেকে এই সময়ে বিলেতের মহিলা-সংঘ 'সীসেম ক্লাবে' শিক্ষা-সম্পর্কে স্বামীজীর এক বক্তৃতার খবর জানা যায়। তাঁর এইবারের বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, সে-বার লণ্ডনবাসীরা স্বামীজীকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের স্বভাব-মাফিক কতকটা যেন হিসেব-নিকেশের মনোভাব ছিল তাঁদের মধ্যে। চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে হৈ-হৈ করা ইংরেজের স্বভাব নয়। তাছাড়া বোধ হয়, সব দেশেই লোকে ধর্মপ্রচারকদের প্রথম প্রথম কতকটা সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তবে বিবেকানন্দ নিজে তাঁর ব্যক্তিত্ব আর বক্তৃতার গুণে সকলেরই হৃদয় জয় করেন। এই সময়ে এই রকম এক সভার শেষে পলিতকেশ

সুপরিচিত এক প্রবীণ দার্শনিক বলেন—'মশাই, আপনি চমৎকার বলেছেন বটে, সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্য ধন্য বলছি, কিন্তু আপনি তো নতুন কিছুই বললেন না।'

সে-কথার জবাবে, সেই সভাকক্ষে তখনই বিবেকানন্দের কণ্ঠে ঝঙ্কার শোনা যায়! তিনি বললেন, 'মশাই, আমি আপনাদের সত্য কী, তাই বলছি। আমি বলেছি যে, চিরকালের পাহাড়-পর্ব্বতের মতো শাশ্বত মানবজাতির মতো, চিরন্তন সৃষ্টির মতো ত্রিকালাতীত পরমেশ্বরের সঙ্গেই সত্যের তুলনা চলতে পারে। আমি যদি সে কথা চমৎকার ভাবেই বলে থাকি, এবং তাতে যদি আপনাদের চিন্তা উদ্রিক্ত হয়ে থাকে, এবং সেই আদর্শে যদি আপনারা আপনাদের জীবন-গঠনের প্রেরণা পান, তাহলে আমার সে-কাজটা কি সত্যি ভালো কাজ ব'লে স্বীকৃত হবে না?'

এই জবাব শুনে সভাকক্ষে প্রশংসার গুঞ্জন ওঠে, হাততালির সমারোহ পড়ে যায়। হ্যামণ্ডের এই স্মৃতিকথায় বলা হয়েছে যে, এইভাবেই বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের অভিভূত করতেন। আর তাঁর এই সব বক্তৃতায় গুরু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কত যে উল্লেখ থাকতো! তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সে-আমলের এই ধর্মভাবনার উৎস ছিলেন স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শ আর রামকৃষ্ণের সংশয়াতীত গৌরব—তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের স্বল্পতম অবকাশেও এই দুটি কথা তিনি নানা সূত্রে ব'লে গেছেন। সে সময়ে এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই স্টার্ডিকে তিনি নারদ-ভক্তিসূত্রের অনুবাদের কাজে সাহায্য করেন। আর সেই মে মাসের শেষ দিকে ২৮এ তারিখে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

ম্যাক্সমুলারের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি স্টার্ডির সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বাড়িতে যান। ৬ই জুন 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় এক চিঠিতে তিনি লেখেন—'কী অসাধারণ মানুষ এই অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর!'

প্রথম সাক্ষাতেই অধ্যাপক তাঁর কাছে কেশব সেনের ভাবজীবনের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জানতে চান। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের কথা ওঠে। ম্যাক্সমুলার ষ্টার্ডি এবং বিবেকানন্দকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। ভারতবর্ষে লোকে তখন হাজারে হাজারে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুজো আরম্ভ করেছে শুনে অধ্যাপক বলেন—'তাঁকে নয়তো মানুষ আর কাকেই বা

পুজো করবে? কাকেই বা চাইবে?' গভীর পরিতৃপ্তি ছিল তাঁর এই উক্তিতে। ম্যাক্সমুলার নিজেই তাঁদের সঙ্গে নিয়ে অক্সফোর্ডের কয়েকটি কলেজ দেখিয়ে আনেন। তারপর অতিথিদের ফেরার সময় হ'লে নিজে তাঁদের ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে আসেন। তাঁর এত আগ্রহ আর এই প্রযত্নের কারণ কী? বিবেকানন্দের প্রশ্ন শুনে শিশুর মত স্নিগ্ধ সত্তর বছরের সেই সরল বৃদ্ধ বলেন—'রোজ রোজ তো আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যের দেখা মেলে না জীবনে!'

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে বিবেকানন্দের খুবই ভালো লাগবার কথা। বিবেকানন্দ তাঁকে ভারত-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগী বলে চিনেছিলেন। তাঁর সহধর্মিণীরও প্রশংসা ক'রে গেছেন তিনি। পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষের মনে ভারত সম্বন্ধে যথার্থ মমতা জাগিয়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই বিদেশী অধ্যাপক। এর কিছু পরে তাঁর The Life and Sayings of Ramkrishna বইখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী লেখেন—'যে সংসারবাদ (পুনর্জন্মবাদ) দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টীয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতিসিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, এমন কি বোধহয় যে, ইতিপুর্ব-জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা এবং পাছে ভারতে আসিলে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর সহসা অনুপস্থিত পুর্বস্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে,এই ভয়ই অধুনা ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক।' ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি আরও লেখেন—'পাশ্চাত্যজগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত অতি ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে ইওরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীতে' প্রকাশ করিলেন[৫], তখন পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের[৬] মধ্যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল।'

এই ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধেই বিবেকানন্দ লিখে গেছেন—'Maxmuller is a Vedantist of Vedantists।'

লণ্ডনে থাকতে থাকতেই একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মনের কথা তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের মধ্যে কক্ষকে ডেকে

৫। আগস্ট, ১৮৯৬, 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬। 'পাদরী সাহেবগণ' ছিলেন একদল আর দ্বিতীয় দল আত্মনিন্দক ভারতীয়।

বলেন। তাঁর সেই কথাগুলিতে গুরুভক্তির সঙ্গে কর্মযোগে তাঁর অটুট আস্থার পরিচয় আছে। তিনি বলেন—

> 'দেখ ফক্স, আমি পল ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিষয় ভাবছিলুম। দেখলুম কি জানো? একটা নগণ্য ইহুদীদের ধর্ম গোটাকতক জেলে মালার হাতে ছিল। সে সময়ে গ্রীক ও রোমান—এরা দুটি প্রধান জাত। ইহুদীরা তখন পরাধীন জাত। পল সেই জেলে-মালাদের ভাবগুলির অ্যাডভোকেট হ'ল। Paul was a learned fanatic; সেইজন্য সে গ্রীক দর্শন ও রোমান সভ্যতাকে উল্টাইয়া ফেলিল।'[৭]

বিবেকানন্দের শিষ্যপ্রমুখাৎ প্রচারিত তাঁর এই আত্মকথাতে পণ্ডিতের এই গোঁড়ামি বা জ্ঞানীর এই অটুট দর্শনানুগত্য সম্বন্ধে তাঁর এই বিশ্বাসের কথা আছে। এতে তিনি জ্ঞানকর্মের নিরন্তর সংযোগের দায়িত্ব নির্দেশ করেন। সকলেই জানেন, রামকৃষ্ণ ছিলেন সন্তানবোধে মায়ের আদেশ পালনের প্রতীক্ষারত। তিনি ছিলেন সর্বধর্মান্বয়ী সাধক। কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ কোনো গোঁড়ামিতে তিনি কোনোকালেই ধরা দেননি। বরং তিনিই ব'লে গেছেন—'যত মত, তত পথ।' বিবেকানন্দ যখন সেণ্ট পলের দৃষ্টান্ত স্মরণ ক'রে গোঁড়ামির কথা বলেছেন, তখন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অদ্বৈত জ্ঞানে অচলা নিষ্ঠা রেখে হিতকর্মে অটুট উদ্যোগের আদর্শ ব্যক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। লোকসংসারে কেবল জ্ঞানকাণ্ডে বিদ্বান্ হয়ে কর্মকাণ্ডে অমনোযোগী হওয়া তিনি নিষ্ফল ব'লেই মনে করতেন। পরমহংস-দেবের দেহত্যাগ ঘটবার পরেই ব্রাহ্মসমাজের ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিত 'পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) এবং সংক্ষিপ্ত জীবন' (২৪শে জানুয়ারী, ১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। তাতে এই কথা লেখা হয় যে—কেশবচন্দ্রের মনে, তথা ব্রাহ্মসমাজে, পরমহংসদেবের প্রভাবেই মাতৃভাবে সাধনার আদর্শ বর্তেছিল। তাঁর নিজের কথায়—'পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে অনেক সরস করিয়া তোলে।' জীবনের অন্ত্যপর্বে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর প্যারিস থেকে ফরাসী ভাষায় সিস্টার ক্রিষ্টিনকে স্বামীজী লেখেন—

৭। 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ', দ্বিতীয় সংস্করণ : মহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ; পৃষ্ঠা ১১৮।

> 'আমেরিকায় উপার্জিত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মুক্ত, পুর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মুক্ত! এ ধরনের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না।···
>
> গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।···
>
> মনে হচ্ছে, 'মা' আমাকে সন্তর্পণে সস্নেহে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। বিঘ্নসঙ্কুল পথে হাঁটবার চেষ্টা আর নয়, এখন পাখির পালকের বিছানা। বুঝলে কি? বিশ্বাস কর, তা হবেই ; আমি নিশ্চিন্ত। আমার এ যাবৎ লব্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ঐকান্তিকভাবে আমি যা চেয়েছি, সর্বদা তা পেয়েছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এ সেই অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতিতে বিশ্বাসেরই সহজ অভিব্যক্তি। স্বামীজীর আসন্ন দিনাবসান-চেতনার এই উক্তির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' প্রবন্ধের এই কথাগুলি মনে পড়ে—

> 'আমাদের কাব্যে গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি, কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন একটা বিপর্যয় দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিঃশ্বাস পড়িতেছে।'

যেমন জীবনব্যাপী কর্মে তেমনি জীবনাবসানের আবাহনে দু-জনের এই সহধর্মিতার নিদর্শন সত্যই আশ্চর্য মনে হয়।

জীবন-রক্ষা, স্বত্ব-রক্ষা, আত্ম-রক্ষা

রামকৃষ্ণ তিরোহিত হবার বছর-দুয়েক আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'একটি পুরাতন কথা'য় অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মানুষের জীবন-রক্ষা, স্বত্ব-রক্ষা, এবং আত্ম-রক্ষা—এই তিনটি প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। এই ভাবটির সঙ্গে বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' বই-দুখানির কোনো কোনো উক্তির মিল দেখা যায়। এ মিল অপ্রত্যাশিত নয়। দুজনেরই চিন্তার মূলে ছিল ভারত-ঐতিহ্যের ধ্যান,—অর্থাৎ স্বধর্ম-রক্ষার প্রেরণা। ভিন্নমুখী নানা আন্দোলনের মধ্যে নবযুগের দাবি মেনে নিয়েও এই স্বধর্ম-রক্ষার তাগিদটিকে উনিশ-শতকের শিক্ষিত ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতিবোধ ব'লতে ইচ্ছে করে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী সংঘাত-সংঘর্ষ ছিল সেকালের অনিবার্য ঘটনা; ইতিহাসের ধারায় তা আমাদের স্বভাবতই ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু অন্ধ রক্ষণশীলতামুক্ত আত্মবল-উপলব্ধির যথার্থ সজাগ মানসিকতাই তো জাতিকে এক কাল থেকে কালান্তরে এগিয়ে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথায়' সে-চেতনার প্রকাশ দেখা যায়।

বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' আরো পরের রচনা। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩০৫-৬ এবং ১৩০৬-৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বর্তমান ভারত'; আর, ঐ একই পত্রিকায় ১৩০৬ থেকে ১৩০৮ সালের মধ্যে বেরিয়েছিল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধে এমন কয়েকটি কথা লেখেন যা তাঁর পরবর্তী জীবনে বার বার উচ্চারিত হয়। যেমন, তিনি লেখেন—

> 'মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তার আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন

উদার আত্মা—সুবিধা, কৌশল, আপততঃ প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না।'

অর্থাৎ, সুদূর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এই কৈশোরক রচনাতেই জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যবোধ এবং উপায়চিন্তা দুইই প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য যদি বৃহৎ হয়, উপায়ও তাহলে তদনুযায়ী নিশ্ছিদ্র হওয়া চাই। ইতিপূর্বে তাঁর এই লেখাটি থেকেই অন্য উদ্ধৃতি দেখা গেছে। এ-প্রবন্ধে তিনি আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 'অনন্ত'কে আশ্রয় করা ছাড়া মানুষের আত্মরক্ষার আর যে কোনো দ্বিতীয় পথ নেই, এ-অভিমত তিনি সরলভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর নিজের সেই কথাগুলি পুনর্বার স্মরণযোগ্য—'অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।'

যিনি যথার্থ আধ্যাত্মিক, তিনি—'কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পলাইবার পথ নির্মাণ করেন না।' শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিকতা সংসারের 'বুদ্ধি-বিবেচনা-বিতর্কের'ও সীমা ছাড়িয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা বৃহত্ত্ববোধে আশ্রিত। সমাজ যতোই পরিবর্তিত হোক্, সমাজকে সুস্থ হ'তে হ'লে আত্মস্থ হ'তেই হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, সমাজের 'প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক'। কথাটির ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লেখেন—

> 'বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাইনা, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।'

তথাকথিত 'বুদ্ধিবিচারগত আদর্শ' যে কী রকম, সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃত ক'রে তিনি লেখেন—

> 'সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ Practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা মন্দ, কিন্তু Political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ

নাই।···কপটতাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল! উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে!'

লক্ষ্য আর উপায় সম্বন্ধে একযোগে এই শুভবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে চলাই রবীন্দ্রনাথের চিরকালের ধর্ম। সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্রাদর্শ—সকল ক্ষেত্রেই সারা জীবন তিনি তাঁর এই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা তাঁর ব্যাপক ও বৃহৎ কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ চিন্তা তাঁর এই 'একটি পুরাতন কথায়' প্রকাশিত হয়। তাই এ-লেখাটির কথা উল্লেখ করা গেল। এই চিন্তারই প্রতিধ্বনির নজীর হিসেবে বিবেকানন্দের নিজের দু' একটি উক্তি দেখা যেতে পারে।

'বর্তমান ভারত'-এর 'ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন'-অংশে তিনি লেখেন—

'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাধারণ জৈব সত্তা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাকেই 'জীবন-রক্ষা' বলেন। কেবলমাত্র স্থূল আয়ু-রক্ষার প্রয়াস তুচ্ছ ব্যাপার, তার ওপর 'স্বত্ব-রক্ষার',—এবং ততোধিক 'আত্ম-রক্ষার' প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন রবীন্দ্রনাথ। আর, বিবেকানন্দ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেখেন—

'তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী—মনে করি, যে কোন প্রকারেই হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে

থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।'

এই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ দুজনেই এই সমাজ-চিন্তা প্রকাশ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ প্রকাশ-রীতির সঙ্গে বিবেকানন্দের ভিন্ন রীতির ভিন্নতা দেখাতে হলে তাঁর 'বর্তমান ভারত'-এর 'শূদ্র-জাগরণ' লেখাটির উল্লেখ করা যায়। বিবেকানন্দের এইসব রচনার প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকহিত' ইত্যাদি প্রবন্ধে এদেশের তদানীন্তন লোকহিত-প্রয়াসের সঙ্গে ইউরোপের শূদ্র-জাগরণের তুলনাভিত্তিক আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত সে-সাদৃশ্য, এবং সেই সূত্রেই অরবিন্দের 'জগন্নাথের রথ' প্রভৃতি রচনার সাদৃশ্য মনে পড়ে। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—

> 'ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে…; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা!'

স্বতই এ-রীতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত-ভঙ্গির কতকটা আবেগগত সাদৃশ্যের ধারণা জাগে। বিবেকানন্দ ঠিক কমলাকান্তের লঘু চাল অবলম্বন করেননি বটে, কিন্তু কমলাকান্তের গভীর আন্তরিকতায় বিষাদ যেখানে ক্রোধে বা ধিক্কারে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, এসব অংশে তারই ছায়া অনুমান করা কষ্টকল্পনা নয়। একদিকে এই বিষাদ, ধিক্কার, ক্রোধ,—অন্যদিকে সারল্য এবং সুস্পষ্টতা রক্ষার দিকে আগ্রহ,—বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে একযোগে এই দুটি বিশেষত্বই চোখে পড়ে। আবেগে বিশ্বাসে তিনি যেমন

জেরিমি টেলর, কার্ডিন্যাল নিউম্যান—অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল্টনের ইংরেজি গদ্যরীতির স্মারক, সুস্পষ্টতার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁর মধ্যে বঙ্কিমের এই দিকটিরও অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'র উপসংহারে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের সম্প্রদায়ভেদ, জাতিবোধ, স্বাধীনতা-সন্ধান ইত্যাদি ব্যাখ্যা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—

> 'আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি হইয়াছে।'

এ নিঃসন্দেহে নিরাবেগ স্পষ্টতারই উদাহরণ। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতি সম্বন্ধে তুলনা এখানে স্বভাবতই মনে আসে। অনেক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বঙ্কিমের মতোই স্পষ্ট বিশ্লেষণে আগ্রহী, অনেক ক্ষেত্রে আবেগময়ও।

বঙ্কিমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্পষ্টতা এবং রবীন্দ্রনাথের সুদূরস্পর্শী অনুভূতি,—ভাষার ক্ষেত্রে এই দুটি অভিমুখিতার কথা ভাবতে গেলে মনে হয় বঙ্কিমের সঙ্গেই বিবেকানন্দের সাদৃশ্য বেশি ছিল। তবে, জীবন-রক্ষার চেয়ে স্বত্ব-রক্ষা বড়ো—এবং স্বত্ব-রক্ষার চেয়ে আত্ম-রক্ষা যে আরো বড়ো—উনিশ শতকের ভারত-ঐতিহ্য-চেতনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমও এ ভাবনা ভেবেছিলেন, বিবেকানন্দও।

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা আর সাহিত্য-সৃষ্টি—দুইই এই ধারণায় আশ্রিত। ব্যক্তি-মনের রহস্য হয়তো প্রত্যেকেই নিজের নিজের মনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখতে পারেন। কিন্তু বৃহৎ সমাজের স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে বৃহত্তর মানসিক সামর্থ্য দরকার হয়। নিজের সীমিত অবস্থান-ভূমি থেকে বৃহৎ জগতের নানা দেশের বিচিত্র ব্যক্তি ও জাতি-মনের স্বরূপ দেখতে হলে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহ থাকা চাই।

'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেকানন্দের লেখা 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধটিতে এ কথার ইঙ্গিত ছিল।

সেই প্রবন্ধটিতেও তিনি 'ত্যাগ' আর 'অধ্যাত্মবিদ্যা' শব্দ-দুটি ব্যবহার করেন। ত্যাগ যে সর্বাধিক শান্তিদাতা, এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন—'সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল!' বঙ্কিমচন্দ্রের মতন গভীর বিষাদে-ধিক্কারে তরঙ্গিত তাঁর সেইসব বাক্যের কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

> 'যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?'

এই শতাব্দীর সূচনাপ্রান্তে জীবিত থেকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি দেখেছেন—'সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর',—'রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব!' তাই ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে জগতের মানব-সমাজের চিন্তায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং তাঁর ভবিষ্যতের অভিপ্রায় দাঁড়ায় এই রকম—

> 'ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।'

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সমসাময়িক এই তিন ভারত-মনীষীরই মিল ছিল এই উপলব্ধিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের শেষ কথাগুলি মনে পড়ে। চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ' কাতর হইও না।'—

'তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন-ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।'

শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছেও ভারতের মূল্যবোধের স্বতন্ত্রতা যখন অপেক্ষাকৃত তমসাচ্ছন্ন ছিল, উনিশ-শতকের প্রথমার্ধ বোধ হয়, সেই পর্ব। সেকালে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ছিলেন বটে। তাঁরাই দীপালোক তুলে ধরেন। তাঁদের আয়ুষ্কালের মধ্যেই ধীরে ধীরে কালবদলের লক্ষণ দেখা দেয়। উত্তরোত্তর অনেকে এসেছেন—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শেষদিকে অনেকের অনেক চিন্তায় জাতির মন পৌঁছেছে আত্ম-শক্তির দ্বিধাহীন আবাহনে। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি ও সমূহ' সেই সময়ের রচনা। 'রাজা প্রজা'ও তারই কাছাকাছি,—বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকের রচনা। সেই 'রাজা প্রজা'তে (১৩১৫) দেখা যায়—

'যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া একটা মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করে—এমন কি ইংরেজ-রাজত্বেও যদি এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।'

বঙ্কিমের আনন্দমঠের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায়—এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান, লোকশিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশু অভাব-মোচনের জন্যেই ইংরেজ-শাসন

প্রসন্নচিত্তে মেনে নেবার পরামর্শ ছিল ; সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছিলেন—'লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।' বঙ্কিম নিজে দেখিয়েছিলেন—'মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন!' দৃশ্যটি পুনরপি ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লেখেন—'জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে ; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে ; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।'

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের পক্ষ থেকে মহাজাতি-গঠনের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সেইরকম ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দের নানা রচনায়, ভাষণে, তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-নির্ভর কর্মপন্থাই সূচিত। লোকজীবনে বল সঞ্চারের জন্যেই আমাদের ব্যক্তি-জীবন তিনি বুদ্ধি-বিচারে এবং প্রেমে-সমবেদনায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত তাঁকে কর্মত্যাগে তাড়িত করেনি। জ্ঞানে—ভক্তিতে উদ্বোধিত হয় তাঁর মন। যুক্তি-তর্ক, কর্ম এবং সংগ্রামের এই পথ তিনি নিজেও বরণ ক'রেছিলেন, দেশ-বাসীকেও অবলম্বন ক'রতে বলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে বোম্বাই থেকে তিনি লেখেন—

> 'আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটা জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।'[১]

অলৌকিক ব্যাপারে অবিশ্বাস ছিলনা তাঁর, কিন্তু তাঁর সমাজ-সত্যের বোধ তাতে আচ্ছন্ন হয়নি। দু'একটি উদাহরণ দিলে এদিকটি পরিস্ফুট করা যাবে। অতএব উদাহরণ স্মরণ করা যাক্।

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা ; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২ দ্রষ্টব্য।

পরিব্রাজক-জীবনে একবার হঠাৎ যেন এক সন্ন্যাসীকে দেখেন! সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়িয়ে ঋক্‌স্তোত্র পাঠ ক'রছিলেন তিনি। সে-পাঠের সুর ঠিক প্রচলিত সুর নয়। সেই সুর শুনে তাঁর মনে হয় যে, প্রাচীন আর্যকণ্ঠে বেদপাঠের যথার্থ ছন্দ কী ছিল, তা যেন তাঁর গোচরে এলো।

আবার, যুক্ত-প্রদেশের তারীঘাট স্টেশনে নেমেছেন একবার প্রচণ্ড এক গ্রীষ্ম ঋতুতে। আগের রাত্রে উত্তর-ভারতের মাঝবয়সী ব্যবসায়ী এক বেনে ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিলেন একই ট্রেনে। ভদ্রলোক সন্ন্যাসে অথবা সংসার-ত্যাগে মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাই তিনি সারা পথ অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন তাঁর এই সহযাত্রী সন্ন্যাসীকে। পিপাসায় যন্ত্রণা পেয়েও স্বামীজী জল পাননি, কারণ জল কিনে দেবার কেউ ছিল না, আর তখন কেনবার পয়সাও ছিলনা তাঁর কাছে। বেনে ভদ্রলোক নিজে জল খেতে খেতে ঠাট্টা ক'রেছেন—'আহা কী মিষ্টি জল, পয়সা থাকলে পাওয়া যায়, পয়সা না থাকলে জুটবে কোথা থেকে?' তারপর তারীঘাট স্টেশনে নেমে পথে ডুরি বিছিয়ে বসে, আরাম ক'রে পুরী-লাড্ডু খেতে খেতে, ক্ষুধার্ত বিবেকানন্দকে অসহায়ভাবে ব'সে থাকতে দেখে তিনি বলেন, 'কী আর করবে বলো, সন্ন্যাসীর তো পয়সা উপায় করার বাসনা নেই, অতএব ধুলোয় বসে নির্জলা উপবাস চালিয়ে যাও।'

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে শুনছিলেন শুধু। এমন সময়ে দৃশ্যে দেখা দেয় এক মোদক—হাতে তার ডুরি আর খাবার,—মাটির কলসে ঠাণ্ডা জল! লোকটি যত্ন ক'রে পথের ধারে ডুরি বিছিয়ে দিল, খাবার রাখলো, জল ঢেলে দিল গেলাসে। তারপর সন্ন্যাসীকে সমাদর ক'রে আহ্বান জানিয়ে বল্‌লে, 'আসুন বাবাজী, আহার করুন, জলপান করুন।'

পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ তো অবাক! বললেন, 'আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, আমি তো কখনো দেখিনি আপনাকে, আপনি আর কারও জন্যে এসব এনেছেন নিশ্চয়।'

—না বাবাজী, রামজী যে স্বপ্নে ঠিক আপনাকেই দেখিয়ে দিলেন—রামজী বললেন, কাল থেকে আপনার খাওয়া হয়নি,—বল্‌লেন, তাড়াতাড়ি আপনাকে খাবার দিয়ে যেতে, তাইতো ঝটপট্ কখানা পুরী ভেজে আর তরকারি বানিয়ে চলে এলুম আপনার কাছে।...আমি অবশ্য প্রথমবার স্বপ্ন

দেখেও আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রামজী কিন্তু আবার জাগিয়ে দিয়ে ঠিক আপনাকেই দেখিয়ে দিলেন!

নরেন্দ্রনাথ সেই ভুরিতে বসে আহার করলেন। তাঁর চোখে জল এলো। বেনে ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন।

এসব সত্য ঘটনা। মনুষ্য-জীবনে এরকম অলৌকিক কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু অলৌকিকের পথ চেয়ে-চেয়ে নিজের বুদ্ধি-বিচার বিসর্জন দিতে যাঁরা উন্মুখ হয়ে ওঠেন, তাঁদের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ কখনোই প্রশ্রয় দেখান নি।

পরিব্রাজক-জীবনেরই আর একটি ঘটনা এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। একবার এক দীর্ঘ ভ্রমণে তাঁর এক সহযাত্রী তাঁকে জিগেস করেন তিনি কখনো হিমালয়ে গেছেন কিনা, সেখানে মহাত্মা সন্ন্যাসীরা তাঁকে কি কি বলেছেন? কলিযুগের শেষ হ'তে আর কতোদিন বাকি?

বানিয়ে বানিয়ে লোকটিকে অনেক অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনালেন নরেন্দ্রনাথ। অনেক নতুন খবর পাওয়া গেলো ভেবে ভদ্রলোক ভারি প্রসন্ন হলেন। নরেন্দ্রনাথ অনাহারে ছিলেন, রেলের টিকিট ছাড়া তাঁর তো আর কোনো পাথেয় ছিল না। সহযাত্রীর দাক্ষিণ্যে তাঁর আহার হোলো। আহার শেষ হ'লে তাঁকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, যথার্থ আধ্যাত্মিকতা যে অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার যাদুবিদ্যা নয়, সেটা সোজাসুজি বুঝতে হবে। ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে শুনলেন।

কেবলমাত্র বুদ্ধি-বিচারে নির্ভরের চেয়েও আধ্যাত্মিকতা বড়ো বটে, কিন্তু বুদ্ধি-বিচার ত্যাগ ক'রে অলৌকিকের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকাটাও আধ্যাত্মিকতা নয়। তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের এই সহযাত্রীকে তিনি বেশ সরলভাবে সে-কথা বলে গেছেন।[২]

২। 'Thinking of diverting him from his distorted notions of what constituted spirituality, the Swami said to him with great vehemence of feeling, 'My friend, you look intelligent. It befits a person of your type to exercise your own discrimination. Spirituality has nothing to do with the display of psychical powers, which, when analysed, show that the man who deals with them is a slave of desire and a most egotistical person. Spirituality involves the acquisition of that true power which is character. It is the vanquishing of passion and the rooting out of

এ দৃষ্টি তিনি কতোটা রামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন, কতোটাই বা শতাব্দীর প্রথমার্ধের রামমোহন প্রভৃতি যুক্তিবাদী চিন্তানায়কদের অনুশীলন-সূত্রে, এবং কতোটো তাঁর অন্যসূত্রে অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল, সেটা কৌতূহলের বিষয়। একালের একজন সাহিত্যসাধকের মন্তব্য মনে পড়ে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভগবৎ-সাধনা ও তৎপ্রাপ্তি। তিনি দার্শনিক মনন বা সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রেরণায় ধর্মকে উপায়রূপে গ্রহণ করেন নাই। এক ঐশ্বরিক আবেশ তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া তাঁহার মনে ভগবৎ-রহস্যভেদের জন্য এক আত্মহারা সর্বাত্মক আবেগের প্লাবন বহাইয়াছিল। এই ঐশী অনুভূতির স্রোতে তিনি যেন 'স্বাধীন ইচ্ছা'-হীন অসহায় শিশুর মতো আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেন রূপকের ছদ্মবেশ পরিহার করিয়া, কাব্যরচনার নিগূঢ় প্রেরণার সহিত কবির আত্মনিয়ন্ত্রিত রচনা সংকল্পের যে রহস্যময় সম্পর্ক, তাহার বোধাতীত স্বতোবিরোধকে অতিক্রম করিয়া পুরাণবর্ণিতা 'শ্যামা মা'-এর সুস্পষ্ট মূর্তিরূপে রামকৃষ্ণের ধ্যাননিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। এই নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভক্তি সাধনা সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম রহস্যের আশ্চর্য স্বচ্ছস্বরূপ উপলব্ধি ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞতার সহজ অধিকার অনায়সলব্ধ সংস্কাররূপে উপহার দিল।'

রামকৃষ্ণের সত্যদর্শন সম্বন্ধে এইটিই প্রচলিত মত। শ্রীকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা উপলব্ধির সঙ্গে রামকৃষ্ণের শ্যামা-সংস্কারের তুলনা করেছেন। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে এদেশে রামকৃষ্ণের আগে যাঁরা

তত্ত্বালোচনামুখর ধর্মপরিবেশে দেখা দিয়ে গেছেন, শ্রীকুমার বাবু মনে করেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যেই যথার্থ ধর্মজিজ্ঞাসা যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয়েছিল—'এ যাবৎ যাঁহারা ধর্ম লইয়া আগ্রহ দেখাইতে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কথঞ্চিৎ কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া কাহারও প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসা জাগে নাই।' তিনি আরো মনে করেন যে, আঠারোর শতকে বা তার আগের কয়েক শতাব্দীতে, এদেশে—'ধর্মসাধনা চিরপ্রথাগত ঐতিহ্যানুযায়ীই অনুষ্ঠিত হইত।' তখন—'ধর্মের অনুশাসন অনুসারে কর্মানুষ্ঠান কয়েকটি বিধিবদ্ধ প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল।' এবং—

> 'ইহার ফল হইয়াছিল যে, ধর্মানুষ্ঠান সমকালীন জীবন-প্রত্যয়ের সহিত অতি ক্ষীণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকিত; চিরাগত নিয়ম পালনের অভ্যস্ত গতানুগতিকতা এই সময়ে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রবল আবেগ সঞ্চার করিতে পারিত না। কাজেই ভক্তির নিষ্ঠা সমাজ-মানসের একটা অংশে ক্রিয়াশীল থাকিলেও এবং প্রাকৃত জনসাধারণের মনে ধর্ম একটা অন্ধ আনুগত্যের মোহ-কুহেলিকা সৃষ্টি করিলেও ধর্মের স্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া জীবনে একটি বৈষয়িকতার চড়াকে অনাবৃত করিয়াছিল! জীবনের নূতন নূতন বৃত্তি ও প্রেরণাগুলি ধর্মের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেও কার্যতঃ ধর্মবোধের নিয়ন্ত্রণ মানিত না।'

তাই তাঁর বক্তব্য এই যে, উনিশ শতকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের কালে পৌঁছেই আমরা প্রথম সমাজ-অভিমুখী, যুক্তিভিত্তিক ধর্মান্দোলনের বিদ্রোহ লক্ষ্য করি। তাঁর নিজের কথায়—

> 'রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মের মূল উৎসে পৌঁছিবার আগ্রহে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা দিলেন ও কতকটা অজ্ঞাতসারে ধর্মানুভূতিকে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধিবার অধার্মিক মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দান করিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে আবেগময়, নবভাবে অনুভূত ধর্মচেতনার সহিত হিতকর অনুশাসন অগ্রাহ্য করিবার, ব্যক্তিগত স্বৈরাচারকে স্বাধীন বিবেকের অভিব্যক্তি বলিয়া ভুল বুঝিবার একটা বেপরোয়া মনোভাব ভাসিয়া আসিল। অযৌক্তিক আচার ও সংস্কারের বন্ধন

হইতে ধর্মকে মুক্ত করিতে গিয়া উহার প্রাণসত্তাকেই ক্ষতবিক্ষত ও দুর্বল করা হইল। কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত পূর্বতন শাস্ত্রবিধিকে অস্বীকার করিয়া নিজ মৌলিক, বিচ্ছিন্ন অনুভবকে নববিধানের মর্যাদা দিলেন ও স্বধর্মসমন্বয়ের ভাবপ্লাবনে হিন্দুধর্মকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন ও বিসর্জন করিলেন। একদিকে শশধর তর্কচূড়ামণির উদ্ভট শাস্ত্রব্যাখ্যা, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমভাবিত, সৌন্দর্য-বোধ-রঞ্জিত, দার্শনিক মনীষা-সমন্বিত হিন্দু সংস্কৃতির জয় ঘোষণা আমাদিগকে এক নূতন ধর্ম-উজ্জীবনের দ্বারদেশে উপস্থাপিত করিল।'

বিবেকানন্দের ধর্মানুভূতি, আধ্যাত্মদৃষ্টি, সমাজচিন্তা ইত্যাদির মূলে দেশের তৎকালীন আবহাওয়া, তাঁর নিজের মনন-অধ্যয়ন,—এবং সর্বাধিক রামকৃষ্ণের প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি যে নিজেকে রামকৃষ্ণের দাস বলে গেছেন, সে-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উনিশ শতকের রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার আগের শতকের রামপ্রসাদের ভক্তি-ভাব ও ঘরোয়া সুরের মিল অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণের প্রভেদের দিকটিও স্মরণীয়। ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার রীতিতে এঁদের সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই সাংসারিক অভিজ্ঞতালব্ধ উপমাদি ব্যবহার ক'রেছেন। আর এঁদের পার্থক্য এই—

'কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাসের যুগে বাস করিয়া রামপ্রসাদ সাধক জীবনের নিগূঢ় ও ছদ্মবেশী অন্তরায়ের প্রতি রামকৃষ্ণের মতো এতটা অন্তর্দৃষ্টিশীল ছিলেন না। তাঁহার দ্বন্দ্ব ছিল সোজাসুজি পাপ ও পুণ্যের বৈষয়িকতা ও ত্যাগের, ধনমান প্রতিষ্ঠার লোভ ও মাতৃস্নেহের বিশুদ্ধ আকর্ষণের মধ্যে। কখন কখন মা-ই দুষ্টামি করিয়া ছেলেকে বিপথগামী করিতেছেন। আপাত-মনোহর খেলনা দিয়া পরমার্থ-বিমুখতার প্রশ্রয় দিতেছেন।...কিন্তু রামকৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারে মায়ের প্রতি অবাধ আস্থা থাকিলেও এরূপ মান-অভিমানের কোন ছেলেমানুষি অভিনয় নাই। আধুনিক জড়বাদের যুগে জীবন[৩]

৩। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্ধৃতিগুলির জন্যে তাঁর প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্মবিবর্তনে বিবেকানন্দ'; বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী পত্রিকা, 'স্মরণিকা' পৃঃ ২১-২৩ দ্রষ্টব্য।

> খুব গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে ও আধ্যাত্ম-সত্য নিষ্ঠাপূর্ণ স্নসন্ধানের বিষয় হইয়াছে। প্রতিদিনের জীবনচর্যার সিঁড়ি বাহিয়া সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে হইবে, সংসার-অভিজ্ঞতার শুষ্ক আলোকে অধ্যাত্মতত্ত্বের স্বরূপ পরিচয় লাভ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মাতার করুণাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কোথাও উহা লইয়া মাতামাতি করেন নাই। তিনি পরম তত্ত্বের লোকজীবনসম্ভব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।...তাঁহার ধর্মোপদেশন সর্বতোভাবে বাস্তব জীবনাশ্রয়ী।'

রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের তুলনায় 'অবাস্তব' বা লোকজীবন-বহির্ভূত উপমাদি ব্যবহার করেছেন, এ-কথা অবশ্যই বিতর্ক-সাপেক্ষ ; আঠারোর শতকে গ্রামীন বাঙালী জীবনের বাস্তব অনুষঙ্গের অভাব নেই রামপ্রসাদের রচনায়। তাই শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ মেনে নিতে কুণ্ঠা হয়। রামপ্রসাদের মৃত্যুর (১৭৭৫) ঠিক একশ বছর পরে,—হেষ্টি সাহেব, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় ১৮৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রামকৃষ্ণের প্রচার শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ঐ সময়ে রামকৃষ্ণ তাঁর ধর্মোপদেশন শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে লোকজীবনের বাস্তব পরিবেশ যে বদলে গেছে, সেটা ধর্তব্য। আমাদের সংস্কৃতির মানচিত্রে কলকাতা এই একশ বছরের মধ্যে বিশেষ গৌরবের জায়গা অধিকার ক'রেছে। কাজে-কাজেই রামকৃষ্ণ উনিশ শতকের সেই কলকাতার এবং কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত দক্ষিণেশ্বরের লোকবোধ্য দৃষ্টান্ত, প্রসঙ্গ এবং উপমাদি ব্যবহার ক'রে গেছেন। বিবেকানন্দ সেই গুরুর কাছেই তাঁর অধ্যাত্মজীবনের এবং লোকশিক্ষার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। শ্রীকুমারবাবু নিজেই লিখেছেন—'বিবেকানন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে রামকৃষ্ণ সাধনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সাধনার প্রয়োগে তিনি গুরুপদিষ্ট প্রথাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।'

গুরুর প্রতি অটুট নিষ্ঠা ছিল শিষ্যের, তবু এই অতিক্রান্তির দিকটিও বিবেচ্য। রামকৃষ্ণের উপলব্ধি তাঁকে অভিভূত করেছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু তাতেও তাঁর সংশয় দূর হয়নি। তখন ব্রাহ্ম-সমাজে যেতেন তিনি। নিরাকার উপাসনায় সে-সময়ে তিনি কিছু দিনের জন্যে এতোই একনিষ্ঠ ছিলেন যে গুরু রামকৃষ্ণের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে গুরুভাই রাখালকে কালী-

প্রতিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে দেখে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন। প্রথম দিকে নরেন্দ্রের এইরকম গোঁড়ামি দেখা দিয়েছে কখনো কখনো। এই গোঁড়ামির কারণ—কেবল বুদ্ধি-বিচারের ওপরেই তখন তাঁর নির্ভর ছিল। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের ওপরেই তাঁর আস্থা ছিল অপরিসীম। রামকৃষ্ণ তাঁকে শুধরে দিয়েছেন।[৪] পরে, এই পরিবর্তনের কথা তিনি নিজেই স্বীকার ক'রেছেন। তখন আর তাই, এ-কথা ভুলতে পারেন নি যে, সত্তার গূঢ়তম সত্য উপলব্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা জড়বিজ্ঞান,—সাধারণ লোকজগতের বুদ্ধি-বিচার ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সহায়ক নয়। সজ্ঞানে, অনর্জিত কোনো আধ্যাত্মিক সংস্কারমাত্র অবলম্বন ক'রে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু এসব লক্ষণ মোটেই গুরুকে অতিক্রম করবার লক্ষণ নয়। কারণ, রামকৃষ্ণের নিজের সাধনায় কোনো কৃত্রিমতা ছিলনা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে বাস ক'রে এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণকে তিনি এবং তাঁর সহযোগী অন্যান্য ভক্ত শিষ্যেরা অত্যন্ত আপন জন ব'লেই অনুভব ক'রেছেন।

ব্রহ্মে গুরু রামকৃষ্ণের যে ধ্রুব আশ্রয়বোধ ছিল, তা তিনি দ্বিধাহীনভাবে প্রথম থেকেই মেনে নেননি। গুরুর সঙ্গে এই দৃষ্টিভেদের জন্যে বিবেকানন্দের মনে কোনো সংকোচ ছিল না। গভীর প্রেমের ফলেই এই অসংকোচ বিচার সম্ভব হয়েছিল। রামকৃষ্ণই তাঁকে তাঁর বিশ্বাস দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণই তাঁকে এই প্রেমে সবল ক'রেছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজেও যেমন নানা মত দেখে দেখে পরিণামে বলতে পেরেছিলেন 'যত মত, তত পথ',—নরেন্দ্রকেও তিনি সেইরকম স্বাধীনভাবে সত্য-সন্ধানে এগিয়ে যেতে দিয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিকে তিনি বাধা দেননি।

পরমের উপলব্ধিতে সেই বুদ্ধিই প্রথম দিকে নরেন্দ্রের বাধা ছিল ব'লে শোনা যায়।[৫] ১৯০৭-এর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সেইসব দিনের স্মৃতি লিখে গেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Three Essays on Religion' সেই সময়ে (১৮৮১-৮২) নরেন্দ্রনাথকে খুবই প্রভাবিত করে। ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাওয়া তাঁর সহজ আস্তিক্য-বিশ্বাস তাতে বিচলিত হয়।

৪। **Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama).** পৃষ্ঠা ৬৩ দ্রষ্টব্য।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫ দ্রষ্টব্য।

হিউমের সংশয়বাদ এই সময়ে তাঁর গোচরে আসে। হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। অথচ রামকৃষ্ণ তখন তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গুরু তাঁকে স্বমতে আকর্ষণ ক'রেছেন, কিন্তু আবদ্ধ করেন নি। ইতিমধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে শেলির নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের নিজের জীবনে তখন তিনটি মতাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত চ'লেছে—বেদান্তের অদ্বৈতবাদ,—হেগেলের নিরুপাধি ভাব বা 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া'—এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ। তিনি তখন বিশ্বাস ক'রতেন যে, সর্বাত্মক জ্ঞান বা 'ইউনিভার্সাল রীজ্‌ন্'-এরই অভিব্যক্তি এই দৃশ্যমান জগৎ। তিনি জানতেন সেই সর্বাত্মক বিচারবুদ্ধিই সকল অভিজ্ঞতার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একমাত্র নিকষ।

তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে ব্রজেন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে, নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিটি শিল্পীর, মেজাজটি যাযাবরের। তখন তাঁর ইন্দ্রিয়বোধ খুবই তীক্ষ্ণ, আবেগ-অনুভূতি প্রবল, স্ফূর্তির প্রবণতা অবাধ। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন যে, অচিরেই তাঁর মধ্যে জ্ঞানে আর প্রবৃত্তিতে গভীর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানেই যে পরিত্রাণ সম্ভব, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে এই কথা জানিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তা শুনেছিলেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের বাচনিক পুনরাবৃত্তি মাত্র চাননি নরেন্দ্রনাথ, তিনি খুঁজছিলেন যথার্থ সেই শক্তি যা তাঁকে রক্ষা ক'রবে,—একজন গুরু, যিনি তাঁকে পথ দেখিয়ে দেবেন। গুরুকে অবলম্বন ক'রে নিজের বিশেষ লক্ষ্যে নিজের পথেই চ'লতে চেয়েছিলেন তিনি।

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা দেশে এই বলিষ্ঠ যুবচিত্তে গুরুলাভের বাসনা পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিবাদী সমসাময়িক পণ্ডিত-সমাজের অনুমোদন যে পায়নি, তার নজীর পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথের নিজেরই উক্তিতে। তিনি লিখেছেন যে, রক্তমাংসের জীবিত মানুষের মধ্যে আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি কি সম্ভব?

নরেন্দ্রনাথ সেই অভিব্যক্তিই খুঁজছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে সেই একই সম্ভাবনা খুঁজেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে যান দক্ষিণেশ্বরে। অবশেষে নিশ্চিতভাবে রামকৃষ্ণই তাঁকে তাঁর পথ বলে দিলেন। সে পথ অদ্বৈত বেদান্তের পথ।

বিবেকানন্দের আত্মচিন্তা, সমাজ-চিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা সবই তাতে পরিতৃপ্তি পায়। গুরুর উপলব্ধিটি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথটি তাঁর নিজের পথ,—এই কথাই ধর্তব্য।

রামকৃষ্ণের তিরোধানের এগার বছর পরে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে প্রথমবার বিলেত থেকে ফেরবার পরে, বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে জিগেস করেন যে, আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার ক'রে আমাদের কী লাভ হবে? তার উত্তরে স্বামীজী বলেন—

> 'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কী আশ্চর্য ধর্মভাবের স্ফুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে।··· এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করে পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে।'[৬]

রামকৃষ্ণ নিজে এই অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেদান্ত সাধনের শেষ কথা এটি।

মৃত্যুর মাত্র তিন-চার দিন আগে রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। তখন দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণায় ভুগছিলেন তিনি। নরেনকে নিজের কাছে ডেকে, কয়েক মিনিট নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে সমাধিস্থ হন তিনি। নরেন্দ্রের শরীরে যেন বিদ্যুৎশক্তির আঘাত লাগে। তাঁর চেতনা বিলুপ্ত হয়। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন রামকৃষ্ণ কাঁদছেন। শিষ্যের ব্যাকুল প্রশ্ন শুনে বলেন, 'নরেন আজ আমি তোকে আমার সর্বস্ব দিয়ে নিজে ফকির হলাম। যে

৬। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ': 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য।

শক্তি তোকে দিলাম তারই গুণে অনেক বড়ো বড়ো কাজ করতে হবে তোকে। কাজ শেষ হলে যেখান থেকে এসেছিস সেখানে ফিরে যাবি।' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—

> 'অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে ; সর্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ; জানিবি সকল মতেরই ইহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।'[৭]

রবীন্দ্রনাথ যাকে গভীর অর্থে 'আত্মরক্ষা' ব'লেছেন, লোকজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রচিন্তাগত—যাবতীয় অবলম্বনভূমি সক্রিয় ভাবে অনুভব ক'রে—এবং রামকৃষ্ণের তুলনায়, বোধ হয়, লোক-সম্পর্ক অনেক বেশি পরিমাণে স্বীকার ক'রে বিবেকানন্দ সেই আত্মরক্ষার সাধনাতেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর গুরুর মতো বলেন নি—'টাকা মাটি, মাটি টাকা'। দেশের যুবশক্তির যথার্থ ব্যাপক উদ্দীপনা ঘটিয়ে তোলার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। দেশপ্রেম তাঁর ঈশ্বরাসক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হয় নি। প্রবল কর্মানুরাগই তাঁর নব্য-বেদান্ত অনুসরণের লক্ষ্য। তিনি বোধ হয়, এই বৃহত্তর লোকসম্পর্ক স্বীকৃতির পথেই গুরু রামকৃষ্ণকে দৃশ্যতঃ অতিক্রম ক'রে গেছেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের এই সাধনারই উল্লেখ ক'রেছেন।[৮]

৭। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ' প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮। 'His Neo-Vedantism sought to release the spiritual ideals of the race not merely, or even mainly, by knowledge and meditation, but by the spiritualisation of the concrete contents and actual relations of life. He therefore strongly urged for the social, economic, and political reconstruction which will be helpful to the development of the highest spiritual life of every individual member of the community.…His trumpet call to all Indians to shed fear and stand forth as men by imbibing *Sakti* (energy and strength) galvanised the current of national life, infused new hopes and aspirations, and placed the service to the country on a high spiritual level.'—The Genesis of Extremism, 'Studies in the Bengal Renaissance' গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০এ নভেম্বর ১৮৯৬, স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গার কাছে এক চিঠিতে লেখেন—'এ-কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।'

যেমন বিভিন্ন দেশের প্রতি, তেমনি বিভিন্ন ধর্মসাধনা সম্বন্ধেও—এদেশের তৎকালীন এই বৃহৎ আগ্রহ-বিস্তারের আবহাওয়াতেই তাঁর অভ্যুদয় ঘটেছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১- ১৯০৭) এবং সে-যুগে এই ধরনের আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জীবন-সাধনায় এই পরিব্যাপ্তির দিকটি চোখে পড়ে। এঁরা প্রত্যেকেই যুক্তি-তর্কের পথ ধ'রে ক্রমে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে এগিয়েছেন,—পর পর নানা ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, অথবা একই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের আদর্শগত ঐক্যের দিকে এঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন।

রামমোহন এদেশে বাংলাভাষায় বেদান্ত-চর্চার পথ খুলে দিয়েছিলেন। আঠারো-শ কুড়ির দশকের শেষ দিকে বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ সূচিত হয়ে উত্তরোত্তর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। ধর্মসাধনায় দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন উদার সাধক; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তাই। নরেন্দ্রনাথ যখন কিশোর বালক,—সেই অবস্থায়, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসভায় মহাহ্নের উপাসনার পরে খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, মুসলমান ও হিন্দু শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন এবং গৌরগোবিন্দ রায়কে গৈরিক বসন উপহার দেওয়া হয়। এইসব বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে তাঁরা উপযুক্ত শ্লোক পাঠ করেন। সেইদিন সন্ধ্যার উপাসনায় কেশবচন্দ্র বলেন—

> 'শিশু ব্রাহ্ম কোন বিশেষ ধর্মশাস্ত্র বুঝে নাই, একেবারে সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই স্বর্গের শিশু কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে ধর্মাকাশে কোটি কোটি তারা দেখিল। সমুদয়ের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল।'

ব্রাহ্ম সাধকের আদর্শ সম্বন্ধে সেদিন তিনি বলেন—

> 'প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে ভালবাসিতে হইবে, অথচ ব্রাহ্মধর্ম

এবং অপর সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রেখা রাখিয়া দিতে হইবে।…পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম এক-একটি অমূল্য রত্ন, ব্রাহ্মধর্ম একটি রত্ন নহে, কিন্তু উহা সে সমুদয় রত্নের মালা।'

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে 'মহাজন-সমাগম' অনুষ্ঠানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মুশা-সমাগম, সক্রেটিস-সমাগম ইত্যাদি বিভিন্ন মহাপুরুষ স্মরণোৎসবের দিকটি সুস্পষ্ট। রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের বিশেষত্ব দেশের তখনকার এই আবহাওয়ারই ফসল। বিবেকানন্দও সেই আবহাওয়ার মানুষ। এইসব প্রসঙ্গ থেকে এই ধারণাই সমর্থিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন কেবলমাত্র বুদ্ধিবিচারগত আদর্শকেই চূড়ান্ত ব'লে মানতে চাননি, বিবেকানন্দও তেমনি যথার্থ সমবেদনার সঙ্গে যথার্থ বুদ্ধিবিচারের যোগ মেনে নিয়ে তাঁর কাজে এগিয়েছিলেন। তাই, শুধু গতানুগতিক 'মুক্তি'র কথাতেই তাঁর জীবন ও রচনার পরিসমাপ্তি নয়,—তাঁর সাধনার ফল জাতিগত এক ব্যাপক অভিব্যক্তিরই অভিমুখী।

বিবেকানন্দের একখানি প্রিয় গ্রন্থ

বিবেকানন্দের ভাষারীতি, রচনা-ভঙ্গি ইত্যাদি সম্বন্ধে এই আলোচনায় ইতিপূর্বে 'সাহিত্য ও সমাজ কথায় বিবেকানন্দ' অংশে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো কোনো কোনো অংশে কয়েকটি মন্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। পরে 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' অধ্যায়ে বিস্তৃততর আলোচনা আছে। কিন্তু তার আগে, এইবার তাঁর একখানি প্রিয় গ্রন্থের প্রসঙ্গ স্মরণযোগ্য।

পরিব্রাজক-জীবনে নরেন্দ্রনাথের প্রিয় বইগুলির মধ্যে 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর নাম সুপরিচিত। এ-লেখার লেখক ছিলেন 'টমাস-আ-কেম্পিস'। তাঁর আসল নাম টমাস হ্যামারলীন অথবা টমাস হ্যামারকেন (Thomas Hammerlein বা Hammerken)। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর লোকান্তরিত হন ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কলোনের সন্নিহিত কেম্পেন ছিল তাঁর জন্মস্থান। খ্রীষ্টকথা-সম্পর্কিত একাধিক বইয়ের লেখক ছিলেন এই টমাস। মূল ল্যাটিন থেকে, পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর 'De Imitatione Christi' ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ইংরেজি ছাড়া আরও অনেক ভাষায় টমাসের এই রচনার অনুবাদ হয়েছে।

শোনা যায়, এক সময়ে জঁা শার্লে দ' গারসঁ নামে (*Jean Charlier de Gerson*) এক ফরাসী ধর্মগ্রন্থকারকেই এ রচনার লেখক মনে করা হোতো। পরে সে ধারণা পরিত্যক্ত হয়। কেম্পেন গ্রামের টমাস-ই এখন এ-লেখার লেখক বলে পরিচিত। বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দ এ-রচনার অনুবাদ শুরু করেছিলেন। শতবর্ষ-স্মরণ-সংস্করণে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে সেই 'ঈশা-অনুসরণ' অংশটুকু সংকলিত হয়েছে।

১২৯৬ সালের 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকায়—স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার বেশ কিছু আগে—ঐ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যা অবধি অনুবাদের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের প্রাক্‌কথা হিসেবে তিনি সংক্ষিপ্ত একটি সূচনা লিখেছিলেন। এই সূচনায় তিনি জানান :

'সব্ সেয়ান্‌কী এক মত'—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই এক প্রকার

মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে।'

'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য-গ্রন্থের মধ্যে পড়ে। পঞ্চাশেরও বেশি ভাষায় এ-লেখা অনূদিত হয়েছে। ম্যাথ্যু আর্নল্ড ব'লে গেছেন যে, এ-বইখানির স্থান বাইবেলের পরেই। বইখানির মোট কথা হোলো ঈশ্বরের মহিমা-বন্দনা। টমাসের কৃতিত্ব তাঁর প্রচুর তথ্যজ্ঞানে এবং গভীর অনুভূতিতে। তাঁর এ-লেখায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্মকথার নানা দিক জায়গা পেয়েছে। আবার সেণ্ট বার্নার্ড, সেণ্ট গ্রেগরি, সেণ্ট আম্ব্রোস, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস,—প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল, সেনেকা, ওভিড ইত্যাদি নানা সাধক ও মনীষীর ধর্মভাবনা এ-বইয়ের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।

রক্তমাংসের মানুষের জীবনে ঐহিক আকর্ষণ যে কত তীব্র হ'তে পারে, এবং সেই ঐহিকতার মায়াজাল কাটিয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে যে কী দুস্তর সাধনা, টমাসের তা অগোচর ছিল না। খ্রীষ্টের আদর্শে জীবনযাত্রীকে নিরন্তর এগিয়ে চ'লতে হবেই—এই ছিল টমাসের বক্তব্য। ঈশ্বরের দিকে অন্তরের টানই এ-জীবনে একমাত্র গ্রাহ্য আকর্ষণ। খ্রীষ্টের জীবন-সাধনের এই আদর্শের সঙ্গে প্লেটোর ভাববাদ তাঁর বিশ্বাসে গিয়ে মিশেছিল ব'লে শোনা যায়। কেবল শুষ্ক যুক্তির পথ ধরেই তিনি তাঁর এই অনুভূতির আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে পৌঁছোননি। তিনি ছিলেন গভীর বোধের মানুষ। তিনি জানতেন—খ্রীষ্টীয় পন্থায় ধর্মাচরণের ফলেই খ্রীষ্টের করুণা-বর্ষণ সম্ভব হ'তে পারে। সেই করুণার ফলেই উপলব্ধি,—এবং উপলব্ধি থেকেই বিশ্বাসের উদয়। টমাসের সেই অকৃত্রিম বিশ্বাসই উনিশ শতকের শেষ দিকে তরুণ নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট'-এর মূলতঃ চারটি পৃথক্ ভাগ। প্রথম ভাগের বিষয় হোলো—আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সতর্কতার প্রয়াস, 'Admonitions profitable for the Spiritual Life'; দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্জীবনের আরো কিছু নির্দেশসূত্র পাওয়া যায়—'Admonitions

concerning the Inward Life'; তৃতীয় খণ্ডে অন্তরের সান্ত্বনা—'On Inward Consolation',—এতে আছে নানা প্রার্থনা; এবং চতুর্থ খণ্ডে ভক্তের ব্যবহার-বিধি—'Of the Sacrament of the Altar'

টমাস এতে সন্ন্যাস আর অনাসক্তির কথা ব'লেছেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন:

> 'যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে, ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব; 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'—সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে ভাষ্যকার ঋষি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।'

নরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—তাঁর এই বঙ্গানুবাদ 'যতদূর সম্ভব অবিকল'—অর্থাৎ মূলের (ইংরেজীর) অনুগামী। তাছাড়া প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের টীকা-টিপ্পনী দিয়েছিলেন তিনি। যেমন, জন-কথিত 'He that followeth me…' (৮।১২) অংশের টীকায় তিনি গীতা স্মরণ করেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যাদি (৭।১৪); পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'শাস্ত্রপাঠ' অংশের প্রথম উক্তির অনুবাদে লিখে গেছেন—'সত্যের অনুসন্ধান শাস্ত্রে করিতে হইবে, বাক্‌চাতুর্যে নহে। যে পরমাত্মার প্রেরণায় বাইবেল লিখিত হইয়াছে, তাঁহারই সাহায্যে বাইবেল সর্বদা পড়া উচিত'—এবং টিপ্পনীতে কঠোপনিষদ্ স্মরণ ক'রেছেন—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (১।২।৯), আর, বাংলায় লিখেছেন—'তর্কের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় না।'

এই আংশিক অনুবাদের শেষ অনুচ্ছেদটি এই—

> 'অতএব মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই হয়; ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না। অতএব যে ব্যক্তি সুখাভিলাষী, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই; যে ব্যক্তি অনিত্য বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করে, তাহারও মনে শান্তি নাই; কেবল যিনি আত্মারাম এবং যাঁহার অনুরাগ তীব্র, তিনিই শান্তি ভোগ করেন।'

এই অংশের টিপ্পনীতেও গীতার (২।৬০) শ্লোক উল্লেখ করা হয়—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।

সেই সঙ্গে বাংলায় তিনি লেখেন—'যে সকল দৃঢ় পুরুষ সংযমী হইবার জন্য যত্ন করিতেছেন, অতি বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহাদেরও মনকে হরণ করে।'

'ঈশা-অনুসরণ'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুটি উক্তি স্মরণীয়। প্রথমটিতে জ্ঞান-সাধনার মূল্যবোধের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে জ্ঞান-সাধনার সীমাবোধের কথা ব্যক্ত হয়ঃ

১। আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি পর্যালোচনা করিতে ব্যস্ত, সেই গর্বিত পণ্ডিত অপেক্ষা কি—যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে?

২। অত্যন্ত জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ কর, কারণ তাহা হইতে অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ ও ভ্রম আগমন করে।

এই অনুবাদ-রচনার কিছু পরে গাজীপুর থেকে লেখা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ মার্চের চিঠিতে প্রমদাদাস মিত্রকে নরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক।' তখন পওহরীবাবার সঙ্গে তাঁর গাজীপুরে সাক্ষাৎ-পর্ব চলেছে। সেই চিঠিতেই পওহরীবাবার বিষয়ে তিনি লেখেন, 'বোধ হয় ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্ত ভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইহাকে উত্তেজিত করা ঠিক নহে, স্থির করিয়াছি; এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যেকালে করিয়াছেন।'

রামকৃষ্ণদেবও নরম মানুষ ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সেই চিঠিতেই তাঁর অহেতুকী দয়ার উচ্ছ্বাসময় উল্লেখ ছিল। সে-চিঠির লেখক-স্বাক্ষরে নিজের নাম লিখেছিলেন 'দাস নরেন্দ্র'।

'ঈশা-অনুসরণ-এর পূর্বোক্ত কথাগুলির সঙ্গে গাজীপুর থেকে লেখা এই চিঠির যোগটুকু অনুভব ক'রে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, সন্ন্যাস অবলম্বনের পথে আত্মার কল্যাণচিন্তা তাঁর কাছে ঐহিক প্রীতি-মমতা বা স্নেহ-অনুরাগের

বিরোধী ছিল না; আচারে এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মে অতি-আনুগত্যও তিনি পছন্দ ক'রতেন না; টমাস-আ-কেম্পিসের খ্রীষ্টীয় আচার-প্রাধান্যের দিকটি তিনি হয়তো ঐ ঈশা-অনুসরণের প্রশংসার মধ্যে গণ্য করেননি। টমাসের অনুভূতির দিকটিই তিনি বিশেষভাবে প্রশংসনীয় মনে করেছিলেন; অন্যান্য দিকে ধর্মসাধনার দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সাধারণ সাধক-মনন ব'লতে যা বোঝায়, সেই দিক্‌টিরই তিনি তুলনামূলক চিন্তা ক'রে গেছেন।

প্রমদাদাসের কাছে লেখা এই চিঠির চার-বছর পরে, ডেট্রয়েট থেকে হেল-ভগিনীদের কাছে লেখা ১৫ই মার্চ, ১৮৯৪ তারিখের চিঠিতে তিনি আবার নিজের প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন। সেই চিঠিতে দেখা যায় —

> 'বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে পড়েছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি, তা বলেছি। আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না; কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি; কিন্তু তা অল্প— অতি অল্প সংখ্যক বাছাই করা লোকের মধ্যেই হওয়া উচিত।'

এই চিঠিতেই তারপর তিনি নিজের প্রচারক-সত্তা সম্বন্ধে যে-কথাগুলি লেখেন, তা' থেকে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটি অনুভব করা যায়—

> 'তাদের যদি ইচ্ছা হয় তো আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করুক—আমি কিছু ক'রব না। কাজের এ একটা যুক্তিযুক্ত বিভাগ মাত্র। একই ব্যক্তি চিন্তা ক'রে তারপর সেই চিন্তালব্ধ ভাব প্রচার ক'রে কখনও সফল হ'তে পারেনি। ঐরূপে প্রচারিত ভাবের মূল্য কিছুই নয়। চিন্তা করবার, বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন।'

তিনি অধ্যাত্মচিন্তার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ নয়, আত্মিক ধ্যানের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ১৮৯৪-এর ঐ চিঠিতেই তিনি লেখেন, 'পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজে ঐরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ যারা সচেষ্ট, তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে।' সে-পর্বে তিনি ভেবেছেন যে, পওহরীবাবার পথে ঠিক এই স্বাধীনতা

ছিল না। তিনি যখন হেল-ভগিনীদের কাছে এ-চিঠি লেখেন, তখন তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ ক'রেছেন। নিজের নাম লিখে গেছেন—'তোমাদের চিরকৃতজ্ঞ ভ্রাতা বিবেকানন্দ।'

আবার সেই ১৮৯৪-এর ২৫এ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক থেকে স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দকে লেখা চিঠিতে এই হেল-পরিবারের পরিচয় দিয়ে, সেখানকার 'ক্রিশ্চান-সায়েন্স' অর্থাৎ রোগ-সারিয়ে-দেবার ব্যাপারে তাঁরই নিজের কথায়—পাশ্চাত্য 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের জনপ্রীতির কথা উল্লেখ ক'রে, বিবেকানন্দ লেখেন, 'বাবুরাম, যোগেন অত ভুগছে কেন?—'দীনাহীনা' ভাবের জ্বালায়। ব্যামো-ফ্যামো সব ঝেড়ে ফেলতে বলো—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যামো-ফ্যামো সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যামো ধরে না কি? ছুট্। ঘণ্টাভর বসে ভাবতে বলো, 'আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি!'

এসব দেখে বোঝা যায় যে, টমাস-আ-কেম্পিসের দৈন্যভাব তিনি ঝেড়ে ফেলেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি আরও লেখেন—

> 'তোমরা সকলে ভাবো—'আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা'; দেখ দিকি কি বল বেরোয়। 'দীনাহীনা'! কিসের 'দীনাহীনা'? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব?'

তাঁর সেই সময়ের নির্দেশ—'আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ।' এই নির্দেশের ব্যাখ্যা ক'রে লেখেন—'বলো, আমার ভেতর সব আছে, ইচ্ছা হ'লে বেরুবে।'

একদিকে সর্বধর্মান্বয়, অন্যদিকে শক্তি-সাধনা—এই দুটি দিকের যুগপৎ অনুশীলনে ইহলোকের নরদেহী মানুষ উন্নততর অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক্—তাঁর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের মধ্যেই তাঁর এ-অভিপ্রায় নিহিত ছিল। ১৮৯৬এ লণ্ডনে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে একটির বিষয় ছিল 'সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন'। এইসব ভাষণের মূল অবলম্বন ছিল বেদান্ত। তবে ক্ষণে ক্ষণে তিনি খ্রীষ্টের কথা স্মরণ ক'রেছেন। যেমন ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন—

> 'যীশু বলিয়াছেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে।' বেদান্তও বলে, উহা পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সকল ধর্মই এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ

> আছে, সে শুনুক।' আমরা যে সত্য এতদিন অন্বেষণ করিতেছি, তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের অন্তরে বর্তমান, আর বেদান্ত শুধু যে উহার উল্লেখমাত্র করে তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত।'

বিভেদই ভ্রান্তি, ঐক্য-দর্শনই জ্ঞান। ১৮৯৬-এর লণ্ডন-বক্তৃতামালায় এই কথাটি তিনি খুবই সহজ করে বুঝিয়ে দেন। ঈশোপনিষৎ স্মরণ ক'রে বলেন—

> যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

গভীর উপলব্ধির দিক দিয়েও এই একত্বদর্শিতা যেমন অনিবার্য, নিম্নতর সাধনভূমিতে সাধারণ ঐহিক সুখশান্তির দিক দিয়েও বেদান্তদর্শনের এই সর্বান্বয়ী ঐক্যসাধনা তেমনি কার্যকরী।

২৯এ অক্টোবর ঐ বক্তৃতা-পর্যায়েই তিনি 'কঠোপনিষৎ' স্মরণ ক'রে 'অপরোক্ষানুভূতি' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেন। সেইসূত্রে যথার্থ ধর্মবোধ সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য এই ছিল যে—'যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে।' এ-কথা উত্থাপন করবার জন্যে একদিকে তিনি 'বিবেকচূড়ামণি' উল্লেখ করেন, অন্যদিকে সেণ্ট ম্যাথুর সুভাষিতাবলী স্মরণ ক'রে বলেন—

> 'বাইবেলের কথা, 'যাহার এক সর্ষপ-পরিমাণ বিশ্বাস আছে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড় তাহার কথা শুনিবে' —এ কথার তাৎপর্য এই, তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে, কেবল বিচারপূর্বক সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই।'

যম-নচিকেতার কাহিনী ব্যাখ্যা ক'রে মৃত্যুতত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত উদ্ঘাটন ক'রতে এগিয়ে তিনি সে-বক্তৃতায় ধর্মবোধ আর উপযোগবাদ বা ইউটিলিটেরিয়ান চিন্তার পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। অনন্তের দিকে আমাদের অস্তিত্বের গতি বা অভিমুখিতা ফিরিয়ে দেবার নামই 'ত্যাগ'। ইহলোকের দুঃখ শরীরের বাতব্যাধির মতন; তা এক জায়গায় কমলে, অন্য জায়গায় আরও

জোরে দেখা দেয়। এইরকম সহজভাবে, তিনি তাঁর এইসব বক্তৃতায় সুখ, দুঃখ, বাসনা, জীবন, মৃত্যু, ত্যাগের সত্য উদ্ঘাটন করেন।

তাঁর এই পর্যায়েরই আর-একটি ভাষণের বিষয় ছিল 'কর্মজীবনে বেদান্ত'। সেই আলোচনায় বেদান্তের একত্ব-ধারণা আর কর্মযোগের কথা ওঠে। তিনি বলেন—

> 'আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়।'

বেদান্তলব্ধ অদ্বয়-আদর্শ এবং কর্মবাদ যে অবিমিশ্র বুদ্ধিচর্চার ফল নয়. সে-কথা তিনি আমেরিকায় বেদান্তশিক্ষার্থীদের কাছে ঠিক এই রকম সহজ ভঙ্গিতেই ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন। সেই সূত্রে মানুষের ভবিষ্যৎ পন্থার নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি। সেই কথাগুলি স্মরণ করেই এ-প্রসঙ্গের ছেদ টানা যেতে পারে। তিনি বলেন—

> 'সর্বশেষে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। মানুষের জ্ঞান, যুক্তি, অনুভব, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির শক্তি—এ সবই জগদ্রূপ দুগ্ধমন্থনে ব্যস্ত। দীর্ঘকালব্যাপী মন্থনের পর আসে মাখন; এবং ঈশ্বরই সেই মাখন। যাঁহারা হৃদয়বান্, তাঁহারা ঐ মাখনই লাভ করেন এবং বুদ্ধিজীবীর জন্য পড়িয়া থাকে শুধু ঘোল বা মাখন তোলা দুধ।'

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের সারল্য বর্তেছিল বিবেকানন্দের বাগ্‌ভঙ্গিতে। তাঁর এই রীতিগত বিশেষত্ব ভোলবার নয়। বিচার-বিতর্ককে তিনি উপেক্ষা করেন নি। শুধু বিচারসর্বস্বতা পরিহার করবার পথ দেখিয়ে গেছেন। কথায় কথায় আবার খ্রীষ্টকথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছিলেন—

> 'তোমাদের মনে আছে, ওল্ড টেস্টামেণ্টে মুশাকে বলা হইয়াছিল, 'তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলো, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্রভূমি।' ঐরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া আমাদিগকে সর্বদা ধর্মানুশীলনে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও শ্রদ্ধালু মনোভাব লইয়া আসেন, তাঁহার হৃদয় খুলিয়া

যাইবে ; অনুভূতির দ্বার তাঁহার জন্য উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং তিনি সত্যদর্শন করিবেন। অর্থাৎ বুদ্ধি এই ঐহিক মাটিতে হাঁটবার জুতো।'

মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে এই জুতো খুলে রেখে, সমস্ত বিভেদকে মিলিয়ে, তবেই দেবতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

'ঈশা-অনুসরণ'-এর কথা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের অতিরিক্ত যুক্তিনিষ্ঠার দিক, এবং উত্তরকালে গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর উদারতর দৃগ্‌ভঙ্গির প্রসঙ্গ কতকটা বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হোলো। বার বার তিনি ধর্মের যথার্থ আচরণের ওপর জোর দিয়ে ধর্মাভিমুখিতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ক'রেছেন ; বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের দেশের মানুষের তুলনা ক'রে য়ুরোপের কর্মোদ্যম আর ব্যবহারিক সাফল্যেরও প্রশংসা ক'রেছেন। শুধু আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গেই নয়, দেশের শিল্প-বাণিজ্য-রাজনীতির কথাও উঠেছে এইসব আলোচনায়। যেমন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' আলোচনামালায় শিষ্যকে তিনি একবার ব্যাবসা ক'রতে বলেছিলেন। শিষ্য তার উত্তরে বলেন—'ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায় পাইব ?' সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ জবাব দেন—'আমি যে ক'রে হোক্ তোকে স্টার্ট করিয়ে দেবো'।

গুরুকৃপায় এই সূচনাটুকু লাভ ক'রে, অতঃপর শিষ্যকে কিন্তু নিজের উদ্যমের ওপরেই নির্ভর ক'রতে হবে। এই উদ্যম, সাহস, কর্মশক্তি, নিষ্ঠা ইত্যাদির প্রসঙ্গ 'ঈশা-অনুসরণেও' বিদ্যমান। বোধ হয়, এই সব কারণেই এ বইখানি তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই ব্যাবসার কথাতেই তিনি শিষ্যকে বলেছিলেন—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস্ তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশজন অগ্রসর হবে।' বলেছিলেন—'একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের ক্রিটিসাইজ করতে যাস্—আহাম্মক ওদের পায়ে ধরে জীবন সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখ্‌গে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে।...কোথাও কিছুই নেই, কেবল কংগ্রেস করে চেঁচামেচি করলে কি হবে!' [৮]

৮। 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'—'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (নবম খণ্ড) পৃঃ ১০৬-৭।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আলোচনা এসব। তার কয়েক বছর আগেই 'ঈশা-অনুসরণ'-এর পূর্বোক্ত আংশিক অনুবাদ শেষ হয়েছে। আবার, এই সূত্রেই এই আলাপ-আলোচনার বছর-তিনেক পরের আর-এক আলোচনা স্মরণ করা যায়। সেটা ১৯০১ সালের সম্ভবতঃ জুন মাসের বিবরণ। বেলুড় মঠে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' কেনা হয়েছে তখন। তার দশ খণ্ড পড়ে ফেলেছেন তিনি! অতঃপর শিষ্যকে বলেন—'এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর্—সব বলে দেবো।' সেইদিনই অসাধারণ ধীমান এই বিবেকানন্দ মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য পাঠ ক'রে শুনিয়েছেন তাঁর এই শিষ্যকে। তারপর ব'লেছেন—

> 'যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুল্‌ব না, এতে দুনিয়া থাক আর যাক'—এই মহাবীরের বাক্য।'[৯]

যে কারণে মেঘনাদবধকাব্য, গীতা, উপনিষদ, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট' ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ, সেই একই কারণে এই 'ঈশা-অনুসরণ'ও তাঁর প্রিয় সাহিত্য। অনুবাদের সূচনা-অংশে বিবেকানন্দ নিজে তাঁর এই প্রিয় গ্রন্থের যে-পরিচিতিটুকু লিখে গেছেন, তাতে গীতার উক্তির সঙ্গে টমাস-আ-কেম্পিসের উপলব্ধির সাদৃশ্যের উল্লেখ তো আছেই, তা ছাড়া এ-দেশে সেকালে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পাদ্রীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ গৌণ। 'ঈশা-অনুসরণ'-এর প্রশংসা-সূত্রে, তিনি যা লেখেন, সে-কথাগুলি আগেই তুলে দেওয়া হ'য়েছে। 'প্যারাডাইস লস্ট' বা 'মেঘনাদ-বধকাব্য' ভক্তি-সাহিত্য নয়,—না ভক্তির টানে নয়, বীর্যের বন্দনা দেখেই ওসব রচনা সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ বোধ করেন।

৯। ঐ, পৃঃ ২১০—২১২।

টমাস-আ-কোম্পিস সম্বন্ধে তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণটি ছিল 'ভক্তসিংহ'। ভক্তির সঙ্গে বীর্যের অন্বয় যে মানসিকতায়, তিনি ছিলেন তারই উদাহরণ। 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর যে-অংশে দৈন্য-ভাবনা. সে-অংশের প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে-মাসে সানফ্রানসিস্কোতে প্রদত্ত গীতা সম্বন্ধে তাঁর এক আলোচনার সংক্ষিপ্ত অনুলিপিতে দেখা যায় যে, তিনি বলেছিলেন—

> 'জগতে একটি মাত্র পাপ আছে, তাহা দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করেন। ওঠ, জাগো, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।'[১০]

১৮৯৫-এর ২৮এ সেপ্টেম্বর 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর নিজের রচনা 'Song of the Sannyasin' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় রাজনীতি-সমাজচিন্তায় কথায় আত্মিক স্বাধীনতা এবং সংস্কারমুক্তির যে আশু-প্রয়োজনীয়তার কথা পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের এই 'সন্ন্যাসীর গানে'ও সেই কথাই ধ্বনিত হয়। 'ঈশা-অনুসরণ'ও এই কারণেই ছিল তাঁর প্রিয় বই। ১৮৯৫-এর জুলাই মাসে নিউইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গার কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ থেকে কয়েক ছত্র এইসূত্রেই স্মরণ করা যায়। তিনি লেখেন—

> 'বাজে সমাজ-সংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হ'লে সমাজ-সংস্কার হ'তে পারে না। কে তোমায় বললে আমি সমাজ-সংস্কার চাই? আমি তো তা চাই না।'

এই চিঠিতেই পূর্বোক্ত 'সন্ন্যাসীর গান'-এর উল্লেখ ক'রে তিনি লেখেন—

> 'নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না।'

১০। ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫১ দ্রষ্টব্য।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডন থেকে ফ্রানসিস লেগেটকে তিনি লেখেন—

> 'বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা এক ঘেয়ে ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ'লে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যন্ত। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না।'[১১]

নিজের এই অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি ব্যাখ্যা ক'রে এই চিঠিরই শেষদিকে তিনি লেখেন—

> 'আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি—ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ সব যুক্তি বিচার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাক্যাড়ম্বরের বাইরে, ও-সব থেকে অনেক দূরে। সাকি, পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই।[১২]

ঈশা-অনুসরণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কারণ তাঁর এই মানসিকতাতেই নিহিত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর 'কালী দি মাদার', 'সঙ্ সব দি সন্ন্যাসীন্', 'টু দি অ্যাওয়েক্ন্ড্ ইণ্ডিয়া,' 'হোল্ড্ অন্ ইয়েট এ হোয়াইল', 'ব্রেভ হার্ট', ইত্যাদি ইংরেজি কবিতাগুলি এই ভক্তি-বিশ্বাস-বীর্যেরই রচনা। 'ঈশা-অনুসরণ' বইখানিতে তিনি এই ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেমের পেয়ালা পূর্ণ বলে অনুভব ক'রেছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে যাঁরা তাঁর শিষ্য, অনুচর বা স্নেহাশ্রিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এই প্রেমই তিনি সঞ্চার ক'রে গেছেন। 'ঈশা-অনুসরণ'-এর অনুবাদ-প্রয়াস বেশ কিছু পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২২ এ সেপ্টেম্বর নিবেদিতার প্রতি তাঁর আশীর্বাণীর ছত্রগুলিতে যেন সেই 'ঈশা-অনুসরণের'ই প্রতিধ্বনি অনুভব করা যায়। বাংলায় এই আশীর্বাণীর অনুবাদ ক'রেছেন অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ—

১১। ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০ দ্রষ্টব্য।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৫-২৫৭ দ্রষ্টব্য।

বীরের সংকল্প আর মায়ের হৃদয়
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদু মধুময়
আর্যবেদী পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে
সকলই তোমার হোক্, আরো আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের কেহ।
ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে এই আশীর্বাণী রচনার ছ'বছর আগে আমেরিকা থেকে বরানগর-মঠের গুরুভাইকে তিনি তাঁর 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' নামে আর একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। মনে হয়, সে-কবিতাটিতে নিজেকে তিনি রামকৃষ্ণের দাস অনুভব করেই লিখেছিলেন—

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ তপ সাধন-ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি-আশ
তাও প্রভু কর পার।

নিবেদিতার প্রতি পূর্বোক্ত আশীর্বচনে সুনির্দিষ্ট যে কর্মসূচীর দিকে তাঁর শিষ্যাকে চালিত করবার ইঙ্গিত দেখা যায়, নিজের ছ'বছর আগেকার শেষোক্ত এই আত্মসমীক্ষার ভাষায় সেরকম কোনো ভারত-সাধনার ব্রত-সংকল্পের ঘোষণা ছিল না। গুরুর প্রতি আনুগত্যই তখনকার প্রধান কথা। একমাত্র গুরুর আদেশ ছাড়া অন্য কিছুই তখন আর তাঁকে আবদ্ধ করেনি।

আরো আগে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে,—অর্থাৎ 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' পত্রিকায় তাঁর 'ঈশা-অনুসরণ'-এর আংশিক অনুবাদ যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা তাঁর চিঠিতে 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর উক্তি স্মরণ ক'রেছিলেন তিনি। সে চিঠির প্রসঙ্গও এ-সমালোচনায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] তারপর ৭ই আগস্টের চিঠিতে আবার ঐ বইখানির

১৩। বর্তমান গ্রন্থের ১১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কথা ছিল। প্রমদাদাসের জন্যে তিনি এক খণ্ড বই পাঠিয়ে লিখেছিলেন—'পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্য ভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পূর্বে পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন তো পড়িয়া আমাকে চির কৃতার্থ করিবেন।'[১৪]

বিবেকানন্দের ধ্যানপ্রবণ যে বিশেষ মনোভঙ্গিটি তাঁর গদ্য-রচনাগুলির নানা অংশে অনুভব করা যায়, তার সঙ্গে শুধু টমাস-আ-কেম্পিসের নয়, আরো কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক নিবন্ধকারের রীতিগত সাদৃশ্য বর্তমান। মিল্টনের গম্ভীর গদ্যের ভাবস্পন্দনের সঙ্গে বিবেকানন্দের গদ্যের কোনো কোনো অংশের সাদৃশ্যের কথা এ-আলোচনায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সার টমাস ব্রাউনের (১৬০৫-৮২) 'রিলিজিও মেডিসি'র রীতি মনে পড়ে। আরুইন এডমান লিখেছেন যে, 'রিলিজিও মেডিসি'র গদ্যে যে সমুন্নত ভাবের স্বতঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে সার টমাস ব্রাউনের নিজস্ব কিছু কিছু ভঙ্গির (idiosyncrasy) কথাও ধর্তব্য বটে,—কিন্তু আশ্চর্য তার আবেগের ছন্দ, বিচিত্র তার অনুভূতির সংগীত। টমাস-আ-কেম্পিসের লেখাতেও সেইরকম আবেগ-অনুভূতির আন্তরিকতা দেখা যায়। আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব দুনিয়ার কোলাহল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবৃত্ত ক'রে নিয়ে, ভাবের ঘরে আত্মসমীক্ষায় ব'সেছেন তিনি। এই বিশেষ মেজাজের জন্যেই সুদূর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, রামকৃষ্ণের শিষ্য নরেন্দ্রনাথের কাছেও সে-বই প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। হয়তো সার টমাস ব্রাউনের লেখাও তাঁর মনের অনুকূল হোতো,—হয়তো রোমের ভাবুক বিটিয়াসের (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) 'দি কনসোলেশন অব ফিলসফি' পড়লেও তিনি সুখী হতেন।[১৫]

১৪। 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে এই নির্দেশটি দেখা যায়—

'Trust not in thine own knowledge nor in the wiliness of any man living: but rather in the grace of God that helpeth meek folk and maketh low them that presume of themselves.' —The Consolation of Philosophy etc.: Modern Library: New York, পৃষ্ঠা ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

১৫। 'Boethius speaks in the sixth century from the prison near Rome where he actually writes the *Consolation* several months before

এ সব রচনার সাদৃশ্যের দিকটি ইতিপূর্বে আলোচিত হ'য়েছে। 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এর প্রথম খণ্ডের যে ছত্রগুলি এখানে একসূত্রে উদ্ধৃত হোলো, সেই ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও গভীর বিশ্বাসের সুরই বিবেকানন্দের অজস্র চিঠিতে, গানে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে। তবে, 'ঈশা-অনুসরণ'-এর আংশিক অনুবাদ রচনার সময়েও, বোধ হয়, তাঁর সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়নি। মুণ্ডকোপনিষদ স্মরণ ক'রে ১৮৮৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর বাগবাজার থেকে তিনি প্রমদাদাসকে লেখেন—

> 'আপনি যে তর্কযুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য তাহাই—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি। তবে কিনা আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভকভক ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন।'[১৬]

টমাস-আ-কেম্পিসের গভীর ভাবমগ্নতাই তাঁর ভাল লেগেছিল। তাঁর সে রচনার মূল কথার পরিচয় দিতে গিয়ে পূর্বোক্ত আরুইন এডমান বিশেষভাবে লেখাটির শেষ কথাগুলি স্মরণ ক'রে লেখেন—যে পথ চিরন্তন স্বচ্ছতার দেশে পৌঁছেচে, এ সেই পথ। কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তির শত দংশনের অস্তিত্ব মেনে নিয়েও সেই সুনিশ্চিত নির্মেঘ উজ্জ্বল ভাবটির উপলব্ধি জাগিয়ে রেখেছেন টমাস-আ-কেম্পিস। প্রতিদিনের অভ্যাসের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। সাধনার শান্ত আচরণগুলির কথা আছে তাতে। আরুইন লিখেছেন—

his execution as a traitor. Thomas a Kempis in tho fifteenth century writes *The Imitation of Christ* from a monastic retreat in the Low Countries in the midst of the barbarities and violences of the religious and secular wars. Thomas Browne, in the seventeenth century in England, fortunate in his personal circumstances of wealth and position, stands aside and half quizzically dreams his bravura prose meditations, the Religio Medici, while a revolution is going on.

The times and the the tempers of each are different. But what each says in the way each says it has a perennial appeal to men trying to find stability in other crises in civilization or in their own souls.'--Irwin Edman-রচিত ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮, 'The Consolation of Philosophy' দ্রষ্টব্য।

১৬। 'পত্রাবলী'—রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৯৪ দ্রষ্টব্য।

'Thomas a Kempis is simply one of that long line of quietists who feel that it is external existence itself that is the great disaster. We are but strangers here; heaven is our home. No improvement in temporal conditions can overcome the essential disease of time itself. The *Imitation* is the little Bible of those who would go home, and find themselves in the quiet ecstasy of union with the eternal.'

বিবেকানন্দের নিজের রচনা 'সময়ে প্রতি'র এই ছত্রগুলি এই সূত্রেই আবার মনে পড়ে—

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করে আলিঙ্গন।

মানুষের এই অনন্ত প্রেমে অধিকারের তত্ত্বটি টমাস-আ-কেম্পিসও নিজের উপলব্ধিগুণে প্রকাশ ক'রে গেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

'I it am that teach to despise earthly things, to be weary of things present, to seek heavenly things, to savour things everlasting, to flee honours, to suffer slanders, to put all whole trust in me and covet nothing outside me and above all things to love me burningly.'[১৭]

প্রেমানুভূতির এই বর্ণনার সঙ্গে বিবেকানন্দের সেই প্রাক্-শিকাগো পর্বের আত্মসন্ধানের অভিজ্ঞতা মিলে গিয়েছিল। আর, তাঁর নিজের কবিতাতেই উত্তম পুরুষের সর্বনামের যে একবচন-রূপটি বার বার দেখা দিয়েছে, সম্ভবতঃ

১৭। Chapter XLVIII, চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সেই অভ্যাসেরও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন কতকটা এই টমাস-আ-কেম্পিস। তাঁর 'I it am' দিয়ে অনুচ্ছেদ শুরু করবার ভঙ্গিটি স্মরণীয়। অবশ্য—ঈশ্বরের নিজের বাণী ঘোষণার এই রীতি—আমাদের ভারতীয় পুরা-সাহিত্যেও ভূরি-পরিমাণে বিদ্যমান। মানুষের সীমিত মন যখন অসীমের উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন বক্তার 'অহং' এই রকম সর্বব্যাপী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাই টমাস-আ-কেম্পিসের মতোই বিবেকানন্দও সেই পরমের কথা লিখেছিলেন—

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ···

কিন্তু টমাস-আ-কেম্পিসের ভক্তমনের অক্লাত্রম দৈন্যবোধ তাঁকে কখনোই স্থায়িভাবে বশীভূত করেনি। ১৮৯৪-এর এক চিঠিতে রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখেছিলেন—

'বলো 'অস্তি অস্তি'; 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল! সোহং সোহং শিবোহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই ব'লে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি?'

'দীনাহীনা' ভাবকে তিনি 'কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয়' ক'রতে বলেছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা সেই ১৮৯৪-এর মার্চ মাসের আর একখানি চিঠির কয়েক ছত্র তাঁর এই প্রেম আর নির্ভয় কর্মসাধনার কথাসূত্রেই এখানে উল্লেখযোগ্য। সেই চিঠিতে য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েদের প্রশংসা ছিল—'কি পবিত্র, স্বাধীন স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী'? আর দেশের কথা-প্রসঙ্গে লেখেন—

'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচিক নৃত্য? দাদা এটি তলিয়ে বোঝ—

ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? সাজা মিলে কি? সর্বশাস্ত্র-পুরাণেষু ব্যাসস্ত বচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।'

তাঁর পাঠে, অভ্যাসে, ধ্যানে, দুঃখে প্রেমের পেয়ালা এই ভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই চিঠিতেই অতঃপর তাঁর সংকল্পের কথা ছিল—

'দাদা এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—কেপ কমোরিনে মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে মেটাফিজিক্স শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু' পা দিয়ে দলেছে।'

ইংরেজি-বাংলায় মেশানো এই চিঠিতেই[১৮] তাঁর সমাজ-চিন্তা, সাহিত্য-প্রেরণা, ধর্মবোধ—তিন বস্তুই এক গভীর প্রেমের রাজসিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! আমেরিকার সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা জেগেছে মনে। লিখেছেন—

'যেমন আমাদের দেশে social virtue-র অভাব তেমনি এ দেশে spirtuality নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে।'

কিন্তু সন্ন্যাসীর পয়সা দরকার কেন? সমাজসেবা চাই, শিক্ষার বিস্তার চাই, নারীর স্বাধীনতা চাই—ভারতবর্ষের অভাব যে দিগন্তব্যাপী। বিভিন্ন ধর্মমত আছে ভারতে,—কিন্তু ধর্ম আমাদের জনসাধারণকে কি দিয়েছে? কতোটুকু দিয়েছে? সেই অক্ষমতার জন্য ধর্ম-ই যে দায়ী, তা নয়। মানুষের নির্মমতাই আসল কারণ—

'We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost

১৮। ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৮-১৪ দ্রষ্টব্য।

individuality and raise the masses. The Hindu, the Mahomedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i. e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion, therefore, is not to blame, but men.'

এই চিঠির দশ দিন পরে ডেট্রয়েট থেকে রেভারেণ্ড হিউমকে তিনি যা লেখেন, তার বঙ্গানুবাদে দেখা যাচ্ছে—

> 'পৃথিবীর কোন ধর্ম অথবা ধর্মসংস্থাপকের বিরুদ্ধে আমার কোন কিছুই বলবার নেই, থাকতে পারে না ;······সব ধর্ম-ই আমার কাছে অতি পবিত্র। সমগ্র ভারতবর্ষকে কখনও খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হবে না ; খৃস্টধর্মের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে—এ-কথাও আমি অস্বীকার করছি'।[১৯]

এই চিঠির বিস্তৃত উদ্ধৃতি এখানে নিষ্প্রয়োজন। অকৃত্রিম খ্রীস্টভক্তের রচনা বিবেকানন্দের প্রিয় 'ঈশা-অনুসরণে'র প্রসঙ্গে ভারতে খ্রীস্টধর্মের সামাজিক সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত এই চিঠি থেকেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়া অন্যত্রও আছে। কিন্তু 'ঈশা-অনুসরণে'র প্রেমের মগ্নতার দিকটিতে তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে,—এইবার তাঁর নিজের সাহিত্য-প্রয়াসের উদাহরণগুলি দেখা যেতে পারে।

বিবেকানন্দের সাহিত্য

বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যরচনাবলী বলতে যা বোঝায়,—যথাক্রমে 'ভাববার কথা', (১৯০৭) 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬) এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২)—সবগুলিই ১৩০৫-৬ থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম চার বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। 'ভাব্‌বার কথা'-র প্রথম রচনা 'বর্তমান সমস্যা'-ই ছিল 'উদ্বোধন'-এর 'প্রস্তাবনা'। 'পরিব্রাজক'

১৯। ঐ পৃ; ৪১৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।

বইখানি উদ্বোধনের প্রথম বছরেই ঐ পত্রিকার পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে ছাপা শুরু হয়। পত্রিকার দ্বিতীয় বছরে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশিত হ'তে থাকে। 'বর্তমান ভারত' পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেই প্রথমে দু'বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর কিছু বাংলা চিঠিও ধর্তব্য।

এই গদ্য-রচনাগুলিতে এবং তাঁর কয়েকটি গানে বা কবিতায় তাঁর সাহিত্যিক প্রয়াসের যা কিছু উদাহরণ বিদ্যমান। তিনি যে মুখ্যত ছিলেন আধ্যাত্মিক আদর্শ উপলব্ধির এক গভীর আধার, এবং গৌণত ছিলেন একজন লেখক, আদিতেই এই কথাটি মানা দরকার। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, সন্ন্যাসী হয়েও অতি তীব্র ভাবে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতার যে-বেদনা বোধ ক'রে গেছেন এবং সেইসঙ্গে যে-উৎসাহ তাঁর সারা জীবনের অবলম্বন ছিল, সেই বেদনা এবং উৎসাহই তাঁর এইসব সাহিত্য-প্রয়াসের প্রধান কথা।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতাটিতে এই মূল ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছিল। সে-কবিতার প্রথম কয়েক ছত্রেই মানব-জীবনের দুঃখ, ব্যাধি, অন্ধকার যে কী নিরন্তর ক্রমে বিদ্যমান এবং সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা যে এখানে কতো ব্যাপক, সে-সব কথার স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়। এই ভাবনা-সূত্রেই তিনি ঐ কবিতায় লেখেন—

> জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন :
> যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গেই কবিতাটি কিন্তু শেষ হয়নি। কারণ, দুঃখই মানব-জীবনের চূড়ান্ত পরিণাম—এ-কথা বলবার মানুষ ছিলেন না তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিবাদ,—রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' প্রবন্ধের নির্দেশ এবং বিবেকানন্দের এই 'সখার প্রতি' কবিতার পরবর্তী ছত্রগুলি একসঙ্গে মনে পড়ে। এই কবিতায় তিনি লেখেন—

> শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
> তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

*　　　　*　　　　*

জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত, আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব'—বলো আর কেবা ? কেবা বলো সবারে চালায় ?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে—প্রেমের প্রেরণ।

এই কবিতাটিরই শেষ দুই ছত্র—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' ইত্যাদি—আমাদের সাহিত্যের বহুল প্রচারিত সেই সব কাব্য-ভগ্নাংশেরই পরিবারভুক্ত হয়েছে, যে পরিবারে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' অথবা মধুসূদনের 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে' ইত্যাদিও বিদ্যমান। অর্থাৎ, বিবেকানন্দের বাংলা লেখাগুলি যাঁরা খুঁটিয়ে পড়েননি, তাঁরাও তাঁর 'সখার প্রতি'-র এ দুটি লাইন জানেন।

'উদ্বোধন' পত্রিকা দেখা দেবার বেশ কিছু আগেই, বিবেকানন্দের গুরুভাই গিরিশচন্দ্র একদিন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন—'স্বামীজীকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানিনা। কিন্তু ওই যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।'

এই 'বেরিয়ে যাবার' ইতিহাসটুকু স্মরণযোগ্য। এ-ঘটনা ঘটে বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়িতে। সেদিন শরৎচন্দ্রকে বেদ অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ ; গিরিশ ঘোষ সেই সময়ে তাঁকে দেশের অন্নাভাব ইত্যাদি স্থূল—কিন্তু অনস্বীকার্য দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ; বিবেকানন্দ সে-কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।[১]

সাহিত্যে, তাঁর এই 'মহাপ্রাণতা'র সত্যই সর্বব্যাপক। আজও তাঁর রচনার সাহিত্য-মূল্য নির্ণয় করা এই কারণেই দুঃসাহসের কাজ। একালে প্রায় সকলেই তাঁর রচনা সম্বন্ধে ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত বিশেষ উচ্চ মূল্য স্থির ক'রে

১। বিশ্ববিবেক—ইন্দ্র মিত্র রচিত 'গিরিশচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ' পৃষ্ঠা ৪১০ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গটিই ইন্দ্র মিত্রের উল্লিখিত রচনার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থে 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে (ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৩-২৪ দ্রষ্টব্য) দেখা গেছে।

রেখেছেন। বলা বাহুল্য, লোকচিত্তের সেই ভক্তিযোগ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাহিত্যের আবেদন যে-সব কলাকৌশলের ওপর নির্ভরশীল, বিবেকানন্দের গদ্য-পদ্য রচনাবলীর সেই কলাকৌশলের দিকটি তাঁর মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে আগ্রহ-অনাগ্রহ ব্যতিরেকেই বিবেচ্য। এখানে এই কথাটিও স্মরণযোগ্য।

তাঁর আর একটি কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের আগে ইংরেজিতে লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা 'Kali the Mother' এই রচনার সঙ্গেই স্মরণীয়। ভক্ত ভাবুকের মনে এটিরও আবেদন সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকেই এ-রচনার প্রশংসা ক'রেছেন। 'সখার প্রতি' কবিতাটিতেই তিনি লিখেছিলেন—

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান.
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বলো কেবা কিবা করে?

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এর পরের রচনা। বিশ্বজগতের সৌন্দর্য-মাধুর্য এবং তার করাল দাহ-দুর্বিপাক,—দু'দিকেরই স্বীকৃতি আছে এ-কবিতাটিতে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ জগতে—'সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা?' এবং রচনাটির শেষ দিকে তাঁর এই উপলব্ধি উচ্চারিত হয়েছে—

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥

মানুষের এই ভয়ও সত্য। জগতে সৌন্দর্য আছে, এও সত্য; এবং সৌন্দর্যের অভাবও সত্য; মৃত্যুরূপা কালী যে ভয়াবহ, তাও সত্য। বীর যিনি, তিনিই এই ভয় উত্তীর্ণ হ'তে জানেন—

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥

পূজা তার সংগ্রামে অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।

প্রধানত সাহিত্যমূল্যের দিকটিই যাঁদের লক্ষ্যস্থল, তাঁদের কাছে এই রচনা —বিশেষত উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের সমকালের রচনা হিসেবে, খুব উচ্চ সমাদরণীয় সাহিত্য ব'লে গণ্য হবে না। আঠারোর বা উনিশের শতকে আমাদের শাক্ত কবিরা এ রকম কবিতা আর ক'টিই বা লিখেছেন, এরকম প্রশ্নও অবান্তর।[২] শুধু এই কথাই বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, রামপ্রসাদ যেমন আঠারোর শতকের বাঙালীর আধ্যাত্মিক বেদনার শক্তিশালী কবি ছিলেন, উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে জাতীয় জীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ বোধ হয়, সেই রকম প্রতিষ্ঠাই দাবি ক'রতে পারতেন—যদি-না ইতিমধ্যে বিচিত্রতর সাহিত্য-বিষয়ে আমাদের জাতীয় চিত্তের ব্যাপক আকর্ষণবোধ এবং সাহিত্যের পরিণততর শিল্পরূপের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সম্ভব হোতো।

অর্থাৎ, বিশেষ ভাবে কবিতাতেই যাঁদের আগ্রহ, তাঁরা ইতিমধ্যে মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনার স্বাদ গ্রহণ ক'রেছেন,—হয়তো আরো কোনো কোনো লেখকের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। এই নতুন কালের কবিতা তখন পাঠক-মনে জায়গা পেয়ে গেছে।

মধুসূদনের প্রতি বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু কবি হিসেবে, তাঁর নিজের কাব্য রচনার মূলে মধুসূদনের কলাকৌশল তাঁর মনোযোগের বিষয় ছিল মনে করবার কোনো নজীর নেই। প্রবল অনুভূতির

২। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' (১৩৬৯) গ্রন্থে তাঁর এইসব রচনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মৃত্যু, অন্ধকার, কালী—বিবেকানন্দের কবিতায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ তিনটি প্রতীক।" আবার—"বিবেকানন্দের কালী-কল্পনায় বাংলার শাক্ত সাহিত্যের রুদ্রমধুরা বিশ্বজননীর রুদ্রাণীরূপটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। মূলতঃ অদ্বৈতসাধক হলেও রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ধারাবাহী বিবেকানন্দ জানতেন, 'তারা আমার নিরাকারা'। এই দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈত প্রয়াণের মধ্য দিয়ে সত্যের ক্রমবিকশিত পরম সত্তাটি আবিষ্কার করাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার বিশিষ্ট দান।"—পৃষ্ঠা ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

ঢেউ থেকেই তাঁর 'Kali the Mother', 'The Song of the Sannyasin', 'The Cup,' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ইত্যাদি রচনাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল বটে, কিন্তু দেশের সমকালীন কাব্য-ভাষার গতি কোন্‌দিকে, অথবা যে ভাষা কবিতার উপযোগী, যাতে সাহিত্য-সচেতন সাহিত্য-রসিক মন অন্য কোনো আনুগত্য ব্যতিরেকেই সাড়া দিতে পারে, সে ভাষা আয়ত্ত করবার মতন বিস্তৃত সময় বা তীক্ষ্ণ আগ্রহ ছিল না তাঁর। সে যাই হোক্, তাঁর গদ্য-রীতির আবেদন কোনো সাহিত্য-রসিক মনই অস্বীকার ক'রতে পারেনা, এবং তাঁর কোনো কোনো কবিতার আবেদনও স্বীকার্য।

ভারত-ধর্মের মূল সত্যটিই তাঁর নিজের উপলব্ধিতে দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের কীর্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় জীবন-দর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলি এইভাবে সাজিয়েছেন—

১। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত, জগদ্ব্যাপী ও জগদাতীত এক অখণ্ড নিত্য বস্তুতে বিশ্বাস।

২। জীবাত্মা বা ব্যক্তিচৈতন্য এই নিত্যবস্তু বা ব্রহ্মস্বরূপের অংশীভূত এবং ইহার উপলব্ধিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

৩। ভারতীয় চিন্তাধারা এই নিত্যবস্তুসম্বন্ধে কোন যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল মতবাদে বিশ্বাসী নহে, বরং ব্যক্তির বুদ্ধি বা অধ্যাত্মশক্তি এবং সাধনানুসারী বহুবিধ বিভিন্ন মতের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করিয়া থাকে।

৪। ইহার ফলে, কোন ঐক্যমতাবলম্বী আদর্শ ও ধর্মপন্থা সকলের উপর বলপূর্বক আরোপিত হয় নাই, বরং ইহাতে উদারতম সহনশীলতা এবং চিন্তা, দর্শন ও ঈশ্বরোপাসনার অসীম স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে।

৫। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ—ইহাদের যে কোনও একটি বা একাধিক পথের মাধ্যমে নিত্যবস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে।

এই সূত্রগুলির ভাষা তাঁরই। এই পাঁচটি ধারা দেখিয়ে তিনি অতঃপর লিখেছেন—

'বহুবিধ জাতিসংমিশ্রণে ভারতের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা, গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এমন সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস ও আশ্রম-ব্যবস্থা, বিশেষ ধরণের ধর্মীয় কৃত্য ও আচার-বিচার বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যেগুলিকে কোনও দিন অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক বলিয়া মনে করা হয় নাই। কর্মবাদ, সংসার অর্থাৎ আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ও আচরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। জীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাযথ সাধনকেই মানুষের পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

ইহাকেই ভারতীয় জীবনাদর্শ বলে। ভারতীয়-আদর্শ বা ভারত-ধর্মের মূল কথা—নিত্যবস্তুর একত্ববোধ এবং বিশ্বপ্রসঙ্গের সমস্তর সমন্বয়, এই বোধের সংজ্ঞা ও সূত্র বেদ-উপনিষদ্ এবং মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্গীতায় পাওয়া যাইবে—ইহাই বাস্তবতঃ ভারতের 'বেদান্তদর্শন'। পৃথিবীতে এখন কোনও ধর্মবিশ্বাস নাই, যাহাতে পরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্ন ভাবে বেদান্তানুযায়ী তত্ত্বকথার কিছু না কিছু নিহিত নাই।'

বিবেকানন্দের সাহিত্য তাঁর জীবনেরই স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রাহ্য। সুনীতিকুমার যাকে 'ভারত-ধর্ম' বলেন, সেই ভারতীয় সত্যবোধের প্রবল আবেগ,—এবং বিশ্বাস-বলিষ্ঠ যুক্তি-তর্কই তাঁর সাহিত্যের বিষয়। সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের মূলে—প্রেরণার উত্তাপ এবং সজ্ঞান অধ্যবসায়ের তক্ষণকলা, দুইই থাকে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে বোধ হয় এর দ্বিতীয়টি অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রচলিত সাহিত্যিক নিরিখে এসব রচনার বিচার সংগত নয়। তাঁর 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' বা অন্য কোনো কবিতা এই কারণেই মধুসূদনের বা রামপ্রসাদের বা রামমোহন রায়ের বা অন্য কোনো কবির রচনার সঙ্গে তুলনা করবার চেষ্টা এই কারণেই পরিহার্য বলে মনে হয়। অথচ, বড়ো বড়ো সাহিত্যিক মনের রচনার যা ফল,—অর্থাৎ তাতে রসিক পাঠকের বোধের যে উদ্দীপনা ঘটে,—সে রকম ফল বিবেকানন্দের রচনা-পাঠেও লভ্য। সুনীতিকুমার প্রশ্ন ক'রেছেন—

'আমি যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি, বিবেকানন্দ আমার জন্য কি করিয়াছেন ;

আমার দেশবাসীদের সম্বন্ধে তিনি কি করিয়াছেন ; এবং সমগ্র মানব-জাতির জন্তই বা কি করিয়াছেন ?'

এই প্রশ্নমালার প্রথম প্রশ্নটি খুবই ব্যক্তিগত, সন্দেহ নেই। এখানে সেই প্রশ্নটিরই উত্তরের কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন—

'বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন যে, আমি নিজের সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন হইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি কি, আমার দেহ-মন-আত্মার দিক হইতে কি হওয়া মানুষ বলিয়া আমার পক্ষে অপেক্ষিত।...উপনিষদ্ ও গীতায় যাহাকে 'সনাতন ধর্ম' বা 'শাশ্বত দর্শন' (আলডুস্ হাক্স্লির Perennial Philosophy) বা বেদান্ত বলা হয়, এবং অতীত ভারতের ভূয়ো-দর্শন ও বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা—ইহারই অভিমুখে তাঁহারা আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন : সংশয় ও নৈরাশ্য এবং আশা ও আশঙ্কার মানসিক সংকটে কেবল এই তত্ত্বই অধ্যাত্ম ও অধিমানসের মধ্যে একপ্রকার সমানুপাত রক্ষা করিতে পারে।'[৩]

এই 'সমানুপাত রক্ষা',—সংশয় ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে এই ব্যাপক অভিযানই বিবেকানন্দের সাহিত্য ও জীবনের সামাজিক ফল। তাঁর পত্রাবলীর নানা চিঠির প্রসঙ্গ এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গার কাছে তিনি যে চিঠি লেখেন, তার বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—

'আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শোন, তোমাদের নিজেদেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার ক'রছ কেন ? যদি কেউ তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই তার সমর্থন করতে এবং আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিতে পার না কেন ?'[৪]

৩। 'বিশ্ববিবেক'—'বেদান্ত ও বিবেকানন্দ', পৃষ্ঠা ২০২-৩ দ্রষ্টব্য।

৪। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২ দ্রষ্টব্য।

এই ছিল তাঁর ভাষা-রীতি। ব্যক্তি বা জাতির দুর্বলতার বিরুদ্ধে কখনো লেখেন 'কচি খোকা'র মতো ব্যবহার চ'লবে না, কখনো বলেন, অত্যাচারীকে 'ঠ্যাঙাতে' হবে। কিন্তু এ সবই বেদান্তশোধিত বজ্রবাণী! ঐ বছর ৯ই জুলাই আমেরিকা থেকে খেতড়ির মহারাজাকে লেখেন—

> 'আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মানুষ। আমি এ দেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই এটা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; কতকগুলিকে সন্ন্যাসী ক'রব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে।'[৫]

এই সামরিকতা,—শ্রান্তিহীন এই রজোভাব তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব। এও তাঁর 'ব্যবহারিক বেদান্তে'র রূপ! সেই ১৮৯৫-এর ২রা আগস্ট নিউইয়র্ক থেকে স্টার্ডিকে লেখেন—

> 'আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা, যখন মানুষ বেদান্তের মহান্ গৌরব উপলব্ধি করিতে পারে তখন মন্ত্রতন্ত্রাদি আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। যে মুহূর্তে মানুষ একটি ঊর্ধ্বতর সত্যের আভাস পায়, সেই মুহূর্তে নিম্নতর সত্যটি স্বতই অন্তর্হিত হয়। সংখ্যাধিক্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সংঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।'[৬]

আবার ৯ই আগস্ট স্টার্ডিকে আর এক চিঠিতে তিনি জানান যে,— ভারতে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে সে-সময়ে বিভিন্ন ধর্মমতের সংঘর্ষ চ'লছিল। ভারতে দ্বৈতবাদ 'ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে,'—আমেরিকাতেও তখন বহু মতবাদের মধ্যে প্রাধান্যলাভের সংঘর্ষ,—'ইহাদের সবগুলিই অল্পবিস্তর অদ্বৈতভাবের প্রতিরূপ, আর যে ভাবপরম্পরা যত দ্রুত বিস্তার লাভ

৫। ঐ পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪১ দ্রষ্টব্য।

করিতেছে, সেইগুলি অদ্বৈত বেদান্তের তত বেশি অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে।'[৭]

এই চিঠির শেষ কথাগুলি এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ ক'রে এ-প্রসঙ্গে ছেদ টানা যেতে পারে, ততোধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। তবে, তাঁর নিজের কথাগুলি সুনীতিকুমারের পূর্বোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার ব'লেই শুধু উল্লেখ নয়,—চিঠির শেষ অংশটুকুর অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হোলো—

> 'ভারতকে আমি সত্য-সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?
>
> কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই একথা সত্য।'[৮]

এই ভারতপ্রেম, মানবপ্রেম—তথা বিশ্বপ্রেমই বিবেকানন্দের সাহিত্যের মূল প্রেরণা। তাঁর মানবানুরাগ শুধু ভারতজনানুরাগ ভাবা ঠিক হবে না। 'ভাববার কথা' প্রভৃতি তাঁর গদ্য-নিবন্ধগুলিতে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর নানা উক্তিতে এই বিশ্বানুরাগের সমর্থন আছে। সে কোনো রকম ললিত, কোমল, মৃদু ভাব নয়। আবার এও মনে রাখা দরকার যে, তিনি রাজনীতির মানুষ নন,—তিনি সমাজবিধিনির্মাতাও ন'ন। John Yale সম্পাদিত 'What Religion is in the words of Swami Vivekananda' (১৯৬২) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ২১) Christopher Isherwood ঠিক এই কথাটির ওপরেই জোর দিয়েছেন—

> 'It is a mistake to think of him as a political figure, even in the best meaning of the word. First

---

৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩ দ্রষ্টব্য।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৫-৪৬ দ্রষ্টব্য।

and last, he was the boy who dedicated his life to Ramkrishna. His mission was spiritual, not political or even social, in the last analysis.'

বীরত্বই তাঁর আদর্শ, কর্মনিয়োগই তাঁর পণ। আলমোড়ায় এক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁকে একবার প্রশ্ন করেন,—মনে করুন, যারা দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার দেখতে বাধ্য হয়, তাদের কর্তব্য কি? স্বামীজী জবাব দেন—'কেন সবলকে ঠেঙাইবে, আবার কি? এই কর্মবাদের মধ্যে তোমার নিজের অংশটা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার—বিদ্রোহ করার অধিকার তোমার সব সময়ই আছে।'

বীরের এই কর্মবাদেই তাঁর আস্থা ছিল। এটিকে যাঁরা উগ্র জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের উদাহরণমাত্র হিসেবে ব্যাখ্যা ক'রতে চান, তাঁরা বিবেকানন্দকে চেনেন নি। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রধানতঃ কবিপুরুষ, বিবেকানন্দ তেমনি প্রধানতঃ বেদান্তবাদী তেজস্বী পুরুষ। নিবেদিতাকে তিনি উদ্বোধিত ক'রেছেন, কিন্তু, বোধ হয়, নিবেদিতার মধ্যেও গুরু বিবেকানন্দের সংকল্পের পূর্ণ সঞ্চার আশা করা ঠিক হবে না। যিনি যেমন অধিকারী, বিবেকানন্দকে তিনি সেইভাবেই বোঝেন,—সেই ভাবেই বোঝা সম্ভব।

তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায়, তাঁর নিজস্ব সমাজ-চিন্তার এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত হ'তে হয়। যে ব্যাপক প্রেম বা বিশ্বানুরাগ তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে, সে তাঁর ভারত-ভাবনার সঙ্গেই জড়িত; তাঁর হিন্দুত্বের সঙ্গেও সেই একই চিন্তার সম্পর্ক তিনি নিজেই দেখিয়ে গেছেন। এইসব কথাসূত্রেই তিনি বলেন—স্বার্থপরতা মানুষের অবলম্বনও বটে, আবার স্বার্থপরতা পরিত্যাজ্যও বটে,—অর্থাৎ সংকীর্ণ স্বার্থচেতনা কখনোই প্রশ্রয়যোগ্য নয়,—তবে, ব্যাপক জাতিপ্রেমের অনুভূতিতে স্বার্থপরতা স্বীকার্য। একটি উক্তিতে তিনি জানিয়ে গেছেন—

'কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হইলেন সগুণ ঈশ্বর। সমষ্টির ইচ্ছাকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। নিয়ম

১। ঐ, ১০ম খণ্ড, 'উক্তি-সঞ্চয়ন', পৃষ্ঠা ২৮৭ দ্রষ্টব্য।

বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এই ; ইহাকেই আমরা কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি।'[১০]

এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর ঈশ্বরবোধেই তাঁর মানববোধ প্রতিষ্ঠিত। এরই মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাও আশ্রিত। ভারতক্ষেত্রে তিনি মানুষের সর্বকালের শ্রেয়ের সমন্বয় দেখতে চেয়েছিলেন। বিশেষ ভাবে তাঁর ভারত-ভাবনার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তিনি ব'লেছেন—

'কেহ কেহ হয়তো প্রাচীন গ্রন্থে, গবেষণাগারে বা স্বপ্নে ভারতবর্ষকে যেমন দেখিয়াছেন, তাহাকে আবার সেইভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন। আমি সেই ভারতকেই আবার দেখিতে চাই, যে ভারতে প্রাচীন যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল তাহার সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিক ভাবে মিলিত হইয়াছে। এই নতুন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর হইতেই হইবে, বাহির হইতে নয়।'[১১]

বেদ-উপনিষদের উপলব্ধিই এই আগামী কালের অবশ্যম্ভাবী অন্বয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বোধ হয় এই উক্তিতে এরকম একটি ইঙ্গিত নিহিত। আর্যসমাজের নেতা স্বামী দয়ানন্দের (১৮২৪-৮৩) কথা মনে পড়ে। তিনি বিবেকানন্দের পূর্বগামী চিন্তানায়ক। দয়ানন্দ নিজে ইংরেজি জানতেন না, পাশ্চাত্য চিন্তাক্ষেত্রের প্রেরণারও তিনি অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে তিনি উদার ভাবনা আর জাতীয়তার মন্ত্র ছড়িয়ে দেন। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি, এদেশে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রীয় চিন্তার যে বৈচিত্র্যময় ধারাটি অগ্রসর হয়েছে, দয়ানন্দ সেই ধারাতেই বিবেকানন্দের অগ্রজ ছিলেন। অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'History of Indian Social and Political Ideas' (জানুয়ারি, ১৯৬৭) বইখানির প্রাসঙ্গিক অংশে (১৪শ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৬৭) জানিয়েছেন যে, রামমোহনের মতো রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ঐতিহাসিক স্তরপারম্পর্যের কোনো ধারণাই ছিল না তাঁর,—রামমোহনের মতন বাস্তব দৃষ্টি বা

১০। ঐ, পৃষ্ঠা ২২১ দ্রষ্টব্য।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ২২১-২২ দ্রষ্টব্য।

লোকাচার-বিচক্ষণতাও তাঁর ছিল না, তবু—'He is the fulfilment of Raja Rammohon Roy and the fore-runner of Mahatma Gandhi'।

ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত—তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের সহজ অধিকারের কথা সুবিদিত। পাঁচ-ছয় বছর নিরন্তর য়ুরোপ-আমেরিকায় অতিবাহিত ক'রেও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর আলোচনার ক্ষমতা কমেনি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে,—বিলেত থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পরে, তিনি যখন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে বাস করেন, তখনকার বিবরণে এ-তথ্য বিদ্যমান।[১২] সেই বিবরণেরই শেষ দিকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়ে গেছেন যে, বিবেকানন্দ বিশ্বাস ক'রতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের 'প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হ'লে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি।' জন-সাধারণের মধ্যে তখন ভারত-ঐতিহ্যের কথাই নতুন ক'রে বলবার দরকার ছিল ব'লে তিনি বিশ্বাস ক'রতেন। তাই তাঁর সাহিত্যের বিষয় এই গুরু রামকৃষ্ণের মহিমা,—ভারতের অদ্বৈত পন্থা,—বীরত্বনির্ভর কর্মবাদ ইত্যাদি, —এবং তাঁর রীতি তীব্র, স্পষ্ট,—ব্যাখ্যায় অকুণ্ঠ,—মনোবলে সার্থক। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি বলেন যে, এদেশে 'লেকচার' দিয়ে কিছু হবে না—'বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে; তারপর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম ক'রে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।'[১৩]

এই কারণেই বিদেশে তিনি ছিলেন ভারত-কথার প্রচারক, এবং দেশে হন আধুনিক ভারত-চিন্তার সংগঠক। দেশের ভাষায় তাঁর আগ্রহ ছিল অকৃত্রিম। তবু, এই সংগঠনব্রতী কর্মনিষ্ঠার জন্যেই বাংলা ভাষায় তিনি

১২। ঐ, নবম খণ্ড, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', পৃষ্ঠা ১৮-২০ দ্রষ্টব্য।

১৩। ঐ, 'স্বামীজীর স্মৃতি', পৃষ্ঠা ৩৯১ দ্রষ্টব্য।

কথনোই ঠিক সাহিত্যিক হ'তে চাননি। ইংরেজিতেও তিনি সাহিত্যিক নন। তাঁকে বাগ্মী এবং ব্যাখ্যাতা বলাই শ্রেয়। বাংলায় তাই তাঁর গ্রন্থ কম,—এখানে সংগঠনেই নিজেকে তিনি উৎসর্গ ক'রে গেছেন। প্রিয়নাথকে বলেছিলেন—'তোরা বিলেত যাবি তাও ভিখিরি হয়ে, কি-না বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড়জোর তাদের ধর্মের দুটো তারিফ ক'রে এলি, বড় বাহাদুরি হ'ল। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ্ যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে।' বলেছেন—'তোদের এই ভিখিরি নাম ঘুচাবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।'[১৪]

ইহজীবনে সাহিত্যই যে তাঁর অভিব্যক্তির প্রধান দিক ছিল না,—সাহিত্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি আনুষঙ্গিক দিক মাত্র, এই সত্যটি সর্বদাই স্বীকার্য। মূলতঃ তিনি সত্য-সাধক।

নিবেদিতা তাঁর এ সত্য হৃদয় দিয়ে অনেকটা বুঝেছিলেন। 'The Master as I saw him' গ্রন্থে সেই পরিচয়ই বিদ্যমান। নিবেদিতার নিজের জীবনেও কতকটা একই ধরনের সত্য-সন্ধানের ব্যাকুলতা ছিল। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত জন্মলব্ধ খ্রীষ্টান ধর্মেই তাঁর আস্থা ছিল,—তারপর সংশয় দেখা দেয়। প্রথমে কিছুদিন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চর্চায়,—তারপর হঠাৎ বুদ্ধদেবের বাণী ও আদর্শের আকর্ষণে কেটে যায় পরবর্তী সাত বছর,—তারপর তাঁর জীবনে দেখা দেন তাঁর গুরু বিবেকানন্দ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই বিবেকানন্দ যখন লোকান্তরিত হন, নিবেদিতার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। তিনিই তখন বিবেকানন্দের কাজের ভার নেবার সর্বাধিক প্রত্যাশিত ব্যক্তি। ৭ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়—'Perhaps his mantle will fall upon his adopted daughter Nivedita'। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' বইয়ে এ-মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রেছেন। রায়চৌধুরী মশাই এও দেখিয়েছেন যে, স্বামীজীর মৃত্যুর দুই সপ্তাহের মধ্যেই ১৯এ জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় আর একটি খবরে এই ঘোষণা প্রচারিত হয় যে,

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৩ দ্রষ্টব্য।

নিবেদিতা অতঃপর বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী-সংঘের সম্পর্ক ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁর কাজ ক'রবেন। অতঃপর ওকাকুরা, সুরেন ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ (তখন অরবিন্দ ঘোষ) প্রভৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক বিপ্লবচিন্তায় তাঁর অংশগ্রহণের কাল শুরু হয়। এই পর্বেই নিবেদিতার বক্তৃতায় স্বামীজীর সম্বন্ধে শোনা গেছে—'verily our great national hero'। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন—'অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বিবেকানন্দকে জাতীয় নেতা বলা সহজ ছিল না। ইহা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-সাপেক্ষ ছিল। নিবেদিতা অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-সম্পন্না ছিলেন।' মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বময়। বাংলার এবং ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবপন্থী বীরের দল এই নিবেদিতা-ব্যাখ্যাত বিবেকানন্দকেই অনুভব ক'রেছেন। এ-কথাও প্রণিধানযোগ্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা যে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপন করেন, সে-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি ছিল লোকবৎসল, ভূয়োদর্শী, শক্তিবাদী বিবেকানন্দের দিকে। রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তিবাদ সে-কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রভাবে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। নিবেদিতাই এই দৃষ্টির নেত্রী-চেতনা। বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি ঐ সময়ে ব'লেছিলেন—'আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারিব না।' গুরুর মতো এই শিষ্যারও ছিল অপরিসীম যোদ্ধৃত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ গুণটির উল্লেখ ক'রেছেন।[১৫]

গত শতকে, নব্বুইয়ের দশকের শেষ দিকে য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে ফিরেই বিবেকানন্দ তাঁর এই বাংলা বই ক'খানি লেখেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সিংহ প্রভৃতির বিবরণ,—স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'[১৬] এবং আরো নানা রচনায় এ-কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

১৫। এই সূত্রে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৯৫৯) বইখানির ২৯ সংখ্যক অধ্যায় (পৃষ্ঠা ২৮৪-৩১১) স্মরণীয়। স্বামীজীর সম্বন্ধে মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন—'সে বিপ্লব রাজনৈতিক নহে, তাহার প্রভাব আরও গভীর, ব্যাপক।'

'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে ['পরিচয়'] রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্পর্কে লিখেছেন—'তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব।'

১৬। ১৩২০ আষাঢ়ের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত।

কিন্তু এখানে এ-প্রসঙ্গ আর বিস্তৃত করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু আর একটি কথার উল্লেখ ক'রেই তাঁর ঐ গল্প-রচনাগুলির বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যাবে।

সে-কথাটিরও খুবই গুরুত্ব আছে। একথা মনে হতে পারে যে, স্বামীজী তো বার বার অদ্বৈত সাধনার ওপর জোর দিয়েছেন। 'আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়'[১৭]—এই যদি তাঁর একমাত্র বক্তব্য হয়, তাহলে জীবসেবা, দান, পরোপকার ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে তিনি যখন সেভিয়ার-দম্পতি এবং অন্যান্য শিষ্যের সঙ্গে বাস ক'রছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণের কথামৃতের সংকলয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে একদিন তাঁর এই আলাপ হয়—

> ম—'দেখ তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়া রাজ্যের কথা। যখন বেদান্ত মতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?'
>
> স্বামীজী—মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?[১৮]

স্বামীজীর এই উত্তরটি স্পষ্ট বটে, কিন্তু জীব-সেবা, পরোপকার,—লোকদুঃখ মোচনের নিত্যকর্ম ইত্যাদি ব্যাপারের উপযোগিতা যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। লোকসাধারণ তো মহেন্দ্রনাথ বা নিবেদিতার মতন ভাববোদ্ধা নন। সেই লোকসাধারণের হৃদয়ে স্থান পেতে পারেন তিনিই, যিনি লোকজননী হ'য়ে ওঠেন। বিদ্যালয় পরিচালনা, রোগীর সেবা, দুর্ভিক্ষে জনত্রাণ ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ নিত্যকর্ম হিসেবে যাঁরা বরণ করেন, জনচিত্তে তাঁদের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত। নিবেদিতা সেই লোকমাতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে

১৭। কুমারী মেরী হেলকে লেখা (১৮৯৫, ১৫ই ফেব্রুয়ারি) কবিতার অনুবাদ,—'স্বামীজীর বাণী ও রচনা', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০ দ্রষ্টব্য।]

১৮। ঐ, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।' আবার—'লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড।' আয়র্লাণ্ডের ধর্মপ্রাণ স্বদেশানুরাগী,—মুক্তিসংগ্রামের সক্রিয় যোদ্ধা ও পরে ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জন নোব্‌লের পৌত্রী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা) তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্বে,—অর্থাৎ বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরে, রাজনৈতিক পরাধীনতাজর্জর ভারতভূমিকে বাঘিনী-জননীর মতো রক্ষা ক'রতে চেষ্টা করেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পরে তিনি বার বার ব'লেছেন—'স্বামীজী আমাকে একটি কাজের ভার দিয়ে গেছেন'। স্বামীজীই তাঁর নাম রেখেছিলেন 'নিবেদিতা'। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি কলকাতায় তাঁর প্রথম আগমন। সেই বছরেই অ্যালবার্ট হলে এবং কালীঘাটে, কালী-সাধনা সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। বাঘিনী-লোকজননীর শক্তিপূজায় বিশ্বাস এবং গুরু বিবেকানন্দের প্রতি অচলা ভক্তি উত্তরোত্তর ভারতের সমাজে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন সত্তার মূল বিস্তার করে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি বারাণসী থেকে এক চিঠিতে বিবেকানন্দ তাঁকে লেখেন—'May Mother herself be your hands and mind' (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪)। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে, সেই বছরেই অক্টোবর মাসে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাংলার ডন সোসাইটি, অনুশীলন-সমিতি প্রভৃতির কাজ আরম্ভ হয় সেই বছরেই। বঙ্গভঙ্গের পরে দেশে যে চরমপন্থী বিপ্লবাত্মক কর্ম ইতস্তত: আত্মপ্রকাশ করে, অরবিন্দেরই প্রভাবে বাঘিনী-জননী নিবেদিতা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তখন স্বর্গত!

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে 'ভাববার কথা'র মোট প্রবন্ধ সংখ্যা ন'টি। প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' ১৩০৪ সালে রামকৃষ্ণের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসবের সময়ে পৃথক পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলারের রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী সম্পর্কিত বইখানির আলোচনা; তৃতীয় প্রবন্ধটি হোলো 'ঈশা-অনুসরণ'-এর 'সূচনা',—সেই সঙ্গে মূল গ্রন্থের ১২টি পরিচ্ছেদের বিবেকানন্দ-রচিত অনুবাদ; চতুর্থ প্রবন্ধ 'বর্তমান

সমস্যা' 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনারূপে প্রকাশিত হয়,—সে-কথা আগেই বলা হয়েছে; পঞ্চম—'বাঙ্গালা ভাষা' ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছে লেখা স্বামীজীর এক চিঠির অংশ; ষষ্ঠ—'জ্ঞানার্জন' জ্ঞানে অধিকার, গুরু-পারম্পর্য, পরা ও অপরা বিদ্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণে নিয়োজিত; সপ্তম রচনাটির নাম 'ভাববার কথা'—ভক্তিমার্গের প্রচলিত কয়েকটি আত্মবঞ্চনার সকৌতুক বিবরণ; এগুলির, অর্থাৎ 'ভাববার কথা'-র অনেকগুলি রচনাই সাধু-রীতির নিদর্শন, তবে বিশেষভাবে এই লেখাটিতে চলিত রীতির স্বচ্ছন্দ মসৃণতারও নজীর বিদ্যমান; অষ্টম প্রবন্ধ 'পারি প্রদর্শনী' ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পারি নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্মেতিহাস আলোচনা-সম্মিলনীতে বিবেকানন্দের বক্তৃতার স্বরচিত বিবরণ; নবম প্রবন্ধ 'শিবের ভূত' নামে লেখাটিও তাঁর চলিত গদ্যরীতির উদাহরণ। তিনি লোকান্তরিত হবার পরে তাঁর বাসকক্ষ থেকে এটি সংগৃহীত হয়। এটিকে বলা হয়েছে 'অসমাপ্ত গল্প'।

এই লেখাগুলির বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে পরিচিতি দেওয়া গেল, ততোধিক বিশদতর বর্ণনা বাহুল্য। তবে 'বর্তমান সমস্যা'য় বিশেষ-ভাবে ভারতবাসীর ভারতে প্রথম প্রবেশের বৃত্তান্ত যে কতকটা অনিশ্চিত, সে-কথা উল্লেখ ক'রে এবং প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রে তিনি এই লেখাটিতে মানব-ভ্রাতৃত্বের ঐতিহাসিক পরিব্যাপ্তির যুগসন্ধিগুলি দেখিয়ে দেন—

> 'অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহ সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষ প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।
>
> 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।
>
> 'ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের

গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ' ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী ; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ…'।

এই ভারতকেন্দ্রিক বিশ্বযোগের সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়ে, এ-নিবন্ধে তিনি ভারতের পক্ষে উদ্যম, ত্যাগ, উন্নতিতৃষ্ণা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন যে ব্যাপকভাবে কাম্য, সেই কথাই জানিয়েছেন। রজোগুণের মধ্য দিয়ে সাত্ত্বিকতায় পৌছুতে হবে—এই ছিল তাঁর বিশেষ নির্দেশ।

এই সমস্যাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অগ্রগতির পথ-প্রদর্শক হবেন যেসব নেতা, তিনি নিজে ছিলেন তাঁদেরই অগ্রগণ্য। 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদেও তিনি এই গুরুর তত্ত্ব জানিয়ে গেছেন। 'প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা' হওয়াটাই যে তাঁর মতন গুরুর নির্দেশ নয়,—বরং জাতির লুপ্তজ্ঞান পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রত্যেক যুগকেই যে পরিশ্রম ক'রতে হয়, তিনি তাঁর নিজের দেশ-কাল স্মরণ ক'রে সেই নির্দেশই দিয়ে গেছেন। এই সত্যের সমর্থক তাঁর ঐ 'জ্ঞানার্জন' নিবন্ধটি।

'ভাববার কথা' বইখানিতে সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম-চিহ্নিত সাধুরীতিতে তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত, চলিত রীতিতেও তদনুরূপ। এই উভয় সামর্থ্যের উদাহরণ হিসেবে এখানে পর পর দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হোলো।

'বর্তমান সমস্যা'য় সাধু রীতির নিদর্শন—

> 'দেখিতেছ না যে, সত্ত্ব গুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে ; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে ; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে

এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?'

এ রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের 'বাবু'-প্রবন্ধের স্মারক। আবার, 'ভাববার কথা'য় 'লোকরহস্যে'র (১৮৭৪) এবং 'কমলাকান্তের' (১৮৭৫) কৌতুকভঙ্গি যেন রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক'-এর (১২৯৩) বিষয়-প্রকৃতির সঙ্গে অন্বিত হ'য়ে বিবেকানন্দের রচনায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সম্মিলিত প্রভাবের উদাহরণ রেখে গেছে। চলিত রীতিতে এই মনোভঙ্গির উদাহরণ—

> 'গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড় কুড়ি ছেলে হ'লে ঐ রকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও চৌম্বক শক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ [দ্বিরাগমন], দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ —সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা ক'রে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয়না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারী নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!'

না, রূঢ় কশাঘাতই যেখানে অত্যাবশ্যক, বিবেকানন্দ সেখানে মোটেই কোমল নন। রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' নাটিকার 'শিরোমণি' লোকটি অনেকটা কৃষ্ণব্যালের মতন বটে, কিন্তু 'বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা', 'দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান' ইত্যাদি প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কলমেও এমন অকুণ্ঠভাবে দেখা দেয়নি। এসব ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশি। তবে, মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'আর্য ও অনার্য' (১২৯২) নাটিকার চিন্তামণি কুণ্ডু আর্যত্ব-গৌরবে বড়োই স্ফীত হয়ে ব'লেছিলেন—'আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের

আর্য জাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতির আচার-ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয়নি।' মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যে, কমলাকান্তের দপ্তরে—আইনের অসংগতি,—ভারত-সমালোচনায় পাশ্চাত্ত্য লেখকদের অপব্যাখ্যান, —দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে রসবোধহীন অনুসন্ধিৎসুর শ্রমব্যর্থতা ইত্যাদির কথা ছিল। শতাব্দীর শেষ দশকে বিবেকানন্দ যখন তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক অভিনিবেশের মধ্যেও সমকালীন সমাজের এবং ব্যক্তি-জীবনের কথা লেখবার অবকাশ পেয়েছেন, তখন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথই তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিষয়-নিরীক্ষায় এবং রীতি-নিয়ন্ত্রণে তাঁকে সাহায্য ক'রেছেন। অবশ্য বিশেষভাবে 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজক' ইত্যাদির চলিত-রীতির বিশ্লেষণে ইতিহাসের আরো একটি দিক স্মরণীয়। ডক্টর সুকুমার সেন প্রভৃতি বাংলা গদ্য-রীতির তত্ত্বালোচকরা তা দেখিয়েছেন। সম্প্রতি বিবেকানন্দের গদ্য-রীতির আলোচনায় অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে-দিকটি দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের আমল থেকে এই চলিত-রীতি প্রচলিত। এই সময় থেকেই—

> 'রঙ্গরস, সাময়িক পত্রে আর্যাতর্জা, 'ঠনঠনের হঠাৎ অবতার-গণে'র মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে লাগল কলকাতার ককনি ভাষায়। নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রমন্যাসেও কলকাতার ভদ্র সমাজের চলিত ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি কলকাতার ককনি বুলিতে—যার ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণে ছাপা হল।'[১৯]

এর আগেই প্যারীচাঁদ কলকাতার 'হালকা চালের আঞ্চলিক ভাষা' ব্যবহার করেন বটে,—তবে, সে-ক্ষেত্রেও সর্বনামে ক্রিয়াপদে অনেক অসংগতি ছিল। পুরো চলিত রীতি না হলেও চলিতের দিকে এই ঝোঁক চালু হ'য়েছে। অসিতকুমার দেখিয়েছেন,—কালীপ্রসন্ন,—'রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতায় ককনির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন

১৯। 'ঊনিশ-বিশ', পৃষ্ঠা ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন।' কালীপ্রসন্ন আর বিবেকানন্দের তুলনাসূত্রেই তিনি লিখেছেন যে, কালীপ্রসন্নের ভাষায়—

> 'কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমন কি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক্-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশি; কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেন নি।'[২০]

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' (১৩৭৪) বইয়ে লিখেছেন যে, চল্‌তি ভাষার ভিতের ওপরেই—'সাহিত্যে এই রীতির প্রথম সূচনা করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ,—তাকে শ্রী ও মর্যাদা দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ' (পৃষ্ঠা ২২৫)। কথাটি একটু অন্যভাবে ব'লতে ইচ্ছে হয়। বিবেকানন্দ কালীপ্রসন্নর গদ্যের ভিৎ ধ'রে তাঁর নিজের বাড়ি তুলেছেন— এরকম ধারণা মানতে চায়না মন। তিনি আপন ব্যক্তিত্ব-গুণে এবং সহজ প্রেরণাবশেই তাঁর নিজস্ব রীতির প্রবর্তক,—অর্থাৎ গদ্যরীতিতে তিনি মার্জিত কালীপ্রসন্ন নন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহ ছিল চল্‌তি বাংলার দিকে। এ-আগ্রহ হয়তো সেকালে আরো কারও কারও ছিল। —কিন্তু অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একথা মানতেই হয় যে, বাংলায় সর্বার্থসাধক সাহিত্যিক চল্‌তি গদ্যের প্রথম প্রবর্তক হলেন বিবেকানন্দ। 'ভাববার কথা'তে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি এই কারণেই বিশেষ স্মরণীয়। ভারত-উন্নয়নের যে বিশেষ সংকল্প তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, এই ভাষারীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধটির শুরুতেই তিনি তাই 'লোকশিক্ষা', 'লোকহিত' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করেন। লেখকদের পক্ষে পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজনীয়,—

> 'কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হ'বে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাতেই

২০। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য।

তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর ?'

এই তত্ত্বটি ঐ ছোটো নিবন্ধেই তিনি পরিস্ফুট ক'রে গেছেন। বাংলায় 'সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল' তাঁর মতে 'অস্বাভাবিক',—অতএব পরিহার্য। বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য ?—এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন—

'প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।'

এই প্রবন্ধেই তিনি আরো লেখেন—

'দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।'

ভাষা ভাবেরই বাহন,—প্রকাশের মাধ্যম। লেখক-বিবেকানন্দের মধ্যে অনুভূতি বা বক্তব্যের চাপ এতোই প্রবল ও অকৃত্রিম ছিল যে, রচনার শিল্পরীতি সম্বন্ধে তাঁকে কখনোই খুঁৎখুঁৎ ক'রতে হয়নি। অলঙ্করণের অনাবশ্যক আতিশয্য তাঁর কোনো রচনাতেই নেই। তাঁর সমাজহিতৈষার সঙ্গে ধর্মচিন্তার স্বচ্ছন্দ মিল দেখে,—উদ্দেশ্য আর উপায়ের সহজ সমীকরণে তাঁর দক্ষতা দেখে, যেমন শ্রদ্ধা হয়, ঠিক সেইভাবেই তাঁর রচনারীতির প্রাঞ্জলতা, বল এবং সৌন্দর্য দেখে তাঁর ভাব ও ভাষার অকপট তেজস্বিতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। তাঁর ভাষারীতি তাঁর লক্ষ্যবোধেরই নিখুঁৎ অভিব্যক্তি, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের চেয়ে তিনি নিজে ছিলেন অনেক বড়ো,—আরো অনেক ব্যাপক ; উদ্দেশ্য সব সময়েই তাঁর সম্পূর্ণ অধীনস্থ ছিল। তিনি উদ্দেশ্যবোধময় ভাবুক ছিলেন।

বোধ হয়, অন্য কোনো লেখকের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে ঠিক এই ধরনের চিন্তা আমাদের মনে দেখা দেয় না ; কারণ, লেখকরা সাধারণতঃ নিজেদের লিখিত রচনাতেই চিত্তাকর্ষক হ'তে প্রয়াসী। এই প্রয়াস তাঁদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশিই। তাই তাঁরা রচনায় সংশোধন করেন বেশি, এক শব্দ কেটে অন্য শব্দ বসান,—তাঁদের একই রচনার বিভিন্ন পাঠান্তর দেখা দেয় ;

তাই নিত্যপলায়নপর মনোভাবের,—অর্থাৎ 'মুড'-এর যোগ্য বচন-সন্ধান তাঁদের লেখক-জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

কিন্তু যেমন কর্মে, তেমনি রচনায় তিনি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। অতিশয় সাবলীল, কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রাজ্ঞ এবং উপায়বিদ্ এক অনাসক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। এই অনুভূতিটুকুই এখানে নিবেদনীয়। এ তাঁর নিজস্ব ভালবাসার সত্য। কথাটি আরো পরিস্ফুট করবার জন্যেই তাঁর এই গদ্য-রচনাগুলির কাছাকাছি সময়ের একটি চিঠি স্মরণ করা চলে। এই ইংরেজি চিঠির বঙ্গানুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়া গেল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর শ্রীনগর থেকে তিনি নিবেদিতার কাছে এই চিঠি লিখেছিলেন—

> 'আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তা হ'লে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয়—এমন লোকও আছে, যারা এরূপ প্রতিদিনই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশি সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে।'[২১]

এই কারণেই তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রাজ্ঞ লেখক ব'লতে হয়। বিরল যে-সব ব্যক্তি-মনে আত্মকর্মের এই লক্ষ্য-অলক্ষ্য-বিচার নিত্যজাগ্রত থাকে, বিবেকানন্দের লেখক-সত্তা সেই শ্রেণীরই উদাহরণ। তিনি অদ্বৈত-সাধক সন্ন্যাসী এবং ভারত-সত্যের প্রবক্তা,—তাঁর লেখক-পরিচয় এই পরিচয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,—এরই অন্তর্ভুক্ত।

'ভাববার কথা'র 'পারি প্রদর্শনী' সম্পর্কিত লেখাটিতে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার সারাংশ তিনি নিজেই রেখে গেছেন। তাতে দেখা যায়, তিনি বেদকেই ভারতের বৌদ্ধাদি সমস্ত মতের উৎপত্তির আকর ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, আবার ব'লেছেন 'আর্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই উৎপন্ন হয়,'—গ্রীক নাটকের কোনো প্রভাব নেই সংস্কৃত নাটকে। এই সব বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলেন—

> 'পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক ভাষায় এক এক

২১। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে।'

তাঁর ভাষা-রীতির আলোচনায় এ প্রসঙ্গের আর বেশি উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। আসল কথাটি এই যে, তিনি ভারত-মহিমায় প্রবল বিশ্বাসী, অথচ যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। ভাষার ক্ষেত্রে, বোধগম্যতার সঙ্গে যথার্থ অনুভূতি সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তাই ছিল তাঁর নিজের রীতি নির্বাচনের নিরিখ।

তিনি যদি প্রধানতঃ সাহিত্যের সাধক হতেন, তাহলে হয়তো 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চলতি বাংলার উপযোগিতা সম্পর্কিত আলোচনা তাঁর চোখে পড়তো,—এবং একদিকে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির এ-অঞ্চলের যাবতীয় প্রয়াসের তিনি তুলনা এবং ব্যাখ্যা ক'রতেন; অন্যদিকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর সঙ্গে চল্‌তি বাংলার পক্ষপাতী কবিদের মধ্যে গোপাল উড়ে বা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা-ভঙ্গির নিপুণ বিশ্লেষণ ক'রে যেতেন তিনি। কিন্তু তিনি তো বাংলা সাহিত্যের গবেষক ছিলেন না! তাই সে-সব তাঁর সময়াভাবেই ঘটেনি। তবে, একথা বিস্ময়কর বটে যে, বিবেকানন্দের শৈশবে গভীর কবি-মনের অধিকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যা ভেবেছিলেন, উত্তরকালে বিবেকানন্দ নিজেই তাঁর ঐ 'ভাববার কথা'র ছোটো প্রবন্ধটিতে অনুরূপ কথাই প্রকাশ ক'রে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাগুলি তাই এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন—

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন?'

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদেশী ইডিয়মের অনুবাদে-অনুকরণে আপত্তি তুলেছিলেন; বিবেকানন্দ কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে'—অর্থাৎ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রথম প্রকাশিত হবার বছর-তিনেক পরে,—বিবেকানন্দের বয়স যখন মাত্র পনেরো বছর,—সেই সময়ে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

> 'এইরূপ' সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।'

টেকচাঁদ ইংরেজিতে 'সুশিক্ষিত' ছিলেন ব'লেই এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল ব'লে বঙ্কিমের ধারণা। আর, সংস্কৃতানুসারী বাংলার পক্ষপাতী রামগতি ন্যায়রত্ন ইংরেজি জানতেন না ব'লেই তাঁর বিরুদ্ধে বঙ্কিমের সরোষ মন্তব্য ছিল এই প্রবন্ধে। 'প্রচলিত ভাষার' বিরুদ্ধে ন্যায়রত্নের আপত্তির কারণগুলির শূন্যতা দেখিয়ে, তিনি শ্যামাচরণেরও সমালোচনা করেন। তারপর লেখেন—'জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই,'—'জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার'; কিন্তু—

> 'তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।'

বঙ্কিম নিজে টেকচাঁদ বা হুতোম কাউকেই সর্বথা স্বীকার্য মনে করেন নি। তিনি 'সরলতা' এবং 'স্পষ্টতা'—এই দুটি গুণই গদ্যরীতির সর্বাধিক আদর্শ ব'লে গেছেন। এই দুটি প্রথমে রক্ষা ক'রে, অতঃপর যা করণীয়, সে-বিষয়ে লিখেছেন—'সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।'

প্রথমে সরলতা এবং স্পষ্টতা রক্ষা করা,—তারপর সৌন্দর্য মিশিয়ে চলা,—এই ক্রম অবশ্য লেখকের মানসিকতার ক্রম নয়,—এটি শুধু বিশ্লেষকের লক্ষ্য ব্যাখ্যানের ক্রম। বলা বাহুল্য, অকৃত্রিম অনুভূতি বা উদ্দেশ্যবোধ—যা বিবেকানন্দের একান্ত বৈশিষ্ট্য,—তাতে মনের একই প্রযত্নে সরলতা, স্পষ্টতা, সৌন্দর্য তিনটিই সাধিত হয়। বিবেকানন্দের ভাষা-রীতির গুরু যদি কাউকে

ব'লতেই হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'নীলকান্ত,' 'জীমূতমন্দ্র' 'মিশ্রণোৎপন্ন' ইত্যাদি তৎসম শব্দের সঙ্গে 'তু ভায়া উদ্বোধন সম্পাদক' বা 'বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে' ইত্যাদি প্রয়োগের সাবলীল সমাবেশে বিশিষ্ট তাঁর 'পরিব্রাজক'-এর প্রবন্ধগুলি সর্বাধিক বঙ্কিমচন্দ্রেরই স্মারক।[২২] দরকার মতন সব রকম শব্দই তিনি ব্যবহার ক'রেছেন। যেমন—'পরিব্রাজক'-এর 'জাহাজের কথা'য় দেখা যায়—

> 'চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গোরুর গাড়ী থেকে 'জয় জগন্নাথের রথ পর্যন্ত, সূতো কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে! এ চাকা প্রথম করল কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি, ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হল, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা।'

বিবেকানন্দ লোকান্তরিত হবার প্রায় বিশ বছর পরে নজরুল ইসলামের কবিতার ধারা শুরু হয় এবং তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম 'অগ্নিবীণা'-ই বোধ হয় তাঁর কবিতার তেজস্বিতার যথাসংকেত। বিবেকানন্দের রচনায় বৃহৎ ভারতীয় ঐক্যের যে মহিমা এবং ভারত-গৌরবের যে বিশেষ উপলব্ধি ব্যক্ত হ'য়েছে, নজরুলের কবিতা ঠিক তারই প্রতিধ্বনি নয় বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের গদ্যে-পদ্যে প্রাঞ্জলতার সঙ্গে অগ্নিগর্ভতার সমন্বয় দেখে, পরবর্তী কবিদের মধ্যে তাঁর প্রসঙ্গে মুকুন্দদাস অথবা নজরুল ইসলামের নাম মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দের রচনায় এই তেজঃশক্তির বাচক হিসেবেই 'অগ্নিবাণী' শব্দটি ব্যবহার ক'রেছেন—

> 'তাঁহার অগ্নিবাণীর স্পর্শে আমাদের জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।...ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম তীব্র আবেগের সঙ্গে এই আবেদন করিয়াছেন যে, অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি সুবিচার না করিলে আমাদের আর রক্ষা নাই।'

২২। 'বঙ্গোপসাগরে' দ্রষ্টব্য—'পরিব্রাজক'।

এই সূত্রেই আরো একটি কথা স্মরণীয়। সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> 'তাঁহার এই সমস্ত মতামত ও ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাইয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, অধ্যাত্মধর্ম অপেক্ষা মানুষের বাস্তব কল্যাণ ও অবহেলিত জনসাধারণের সামাজিক অধিকারের কথাই তিনি বুঝি অধিকতর আবেগের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ তাঁহাকে এই দীক্ষা দিয়াছে যে, মানবসেবা ও দেবসেবা একে অপরের পরিপূরক।'[২৩]

'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'—সব ক'টি গ্রন্থেই এই বেদান্ত-বিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমিক, আন্তর্জাতিক বিবেকানন্দের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ধর্মকথা, পুরাণচিন্তা, ব্রহ্মকথা ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর সব কথাতেই ছড়িয়ে থাকে। 'পরিব্রাজকে'র লেখাগুলিও এই সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম নয়।

তাঁর এসব রচনায় সহজ পরিহাসের মেজাজও যেন নিত্যমুখর। এই অর্থে সরসতাও তাঁর রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল' প্রসঙ্গ এই সূত্রেই পুনরায় স্মরণীয়। এই পরিহাসভঙ্গিরও আবার বর্ণবৈচিত্র্য আছে। কৃষ্ণব্যাল প্রসঙ্গে একরকম অভিব্যক্তি দেখা গেছে,—ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তি। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—যেমন, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের এই সমুদ্র-ভ্রমণের মধ্যেই আর-এক ভঙ্গির নমুনা আছে। এই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ (তিনিই 'তু ভায়া'),—আর ছিলেন নিবেদিতা। পরিব্রাজক-বিবেকানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে এক চিঠিতে লেখেন—

> 'কোথায় তোমার সাত দিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ-চঙ মশলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি। ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন থপ্ ক'রে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বলো।'

তুলসীদাসের দোঁহা স্মরণ ক'রে লিখেছেন—

> 'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান, গুজরাত'

২৩। বিশ্ববিবেক, 'বেদান্ত ও বিবেকানন্দ', পৃষ্ঠা ২০৫ দ্রষ্টব্য।

আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত, মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলিকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক বিচিত্রিত ছালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁবকাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভ দৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দরভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।'

'শ্যামাচরণ' চরিত্রটিকে উপস্থাপিত ক'রে এইভাবে ঈষৎ কটাক্ষ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে দূরপাল্লার ভ্রমণের বাস্তব স্বাদ নিজের রচনায় তিনি সাধ্যানুসারে বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রেছেন।

অবশ্য, 'পরিব্রাজক' রচনার অনেক আগে থেকেই বিবেকানন্দের ভারত-ভ্রমণ, তথা বিশ্বপরিক্রমা শুরু হয়। এই বইখানির প্রধান কথা দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার জলপথের বিবরণ মাত্র। ভ্রমণ-দৃশ্যের বর্ণনাও আছে, ভ্রমণকালীন বিভিন্ন চিন্তাও এতে রূপ পেয়েছে। কিন্তু ঠিক এই ধরনের রচনা যে তিনি এ-বইয়ের আগে আর কিছুই রেখে যান নি, তা নয়। প্রায় পাঁচ বছর আগে, ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে লেখা তাঁর একখানি চিঠি[২৪] উদাহরণ হিসেবে এখানে স্মরণযোগ্য। এরকম আরো অনেক চিঠি আছে। যাই হোক, এই চিঠিতে তিনি লেখেন—

'এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা

২৪। পত্রাবলী, ১০২ সংখ্যক পত্র, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', [ষষ্ঠ খণ্ড] পৃষ্ঠা ৪৩১ দ্রষ্টব্য।

আমাদের বৈশাখের গরমি, আর এখানে এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত।...

এরা গরমিকালে বাড়ি ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোন জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেমনি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে পাঁচগুণ সেই জিনিস কলকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না।...'

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও সব হজম।...'

এ চিঠির আটপৌরে রীতি,—এর বিষয়-প্রকৃতি,—এখানকার ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ ভাব 'পরিব্রাজক'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুধ, দই, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি আহার্যের উল্লেখ আছে, আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধেও মন্তব্য আছে, যেমন—

'নায়াগারা ফল্‌স্ হরির ইচ্ছায় সাত-আটবার তো দেখলুম। খুব গ্রাণ্ড বটে, তবে যত শুনেছ তা নয়। একদিন শীতকালে অরোরা-বোরিয়ালিস হয়েছিল।'

আবার সমাজের কথা,—নিজেদের সন্ন্যাসী-সংঘের কথা,—নিজের সামাজিক কর্তব্যের কথাও ছিল এ চিঠিতে—

'সমাজকে, জগৎকে electrify ক'রতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents। তাই যদি পারো তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার করে খাওগে। মিছে eating the begging bread of idleness is of no use। বুঝলে বাপু? কিমধিকমিতি?

Character formed হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু'হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে?'

তাঁর সাহিত্যকর্ম আর সমাজচিন্তা দুই-ই এইরকম অনেক চিঠিতে, বক্তৃতায় সাবলীল ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'পরিব্রাজকে' অবশ্য ভ্রমণের দৃশ্য-বর্ণনাই বেশি,—ভারত-সমাজের জাগৃতি বিষয়ে চিন্তা, অথবা নিজের প্রবল সংকল্পের ঘোষণা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ইউরোপের সভ্যতার কথা ব'লতে-ব'লতে—ফ্রান্স, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি দেখতে-দেখতে, তিনি বার বার ভারতবর্ষের কথা এবং অনেক সময়েই বাংলার কথা লিখেছেন। অতএব এইসব উক্তি তাঁর সমাজচিন্তার কথাপ্রসঙ্গেও বিবেচ্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে,—তথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে গভীর জাতীয়তার ভাব ছিল, এইসব ভ্রমণের দৃষ্টিসুখে সে দিকটি আবৃত হ'য়ে যায়নি। ইউরোপের কথা লিখছেন কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ থেকে,—সঙ্গী ছিলেন মার্কিন মহিলা কুমারী ম্যাকলাউড,—ফরাসী দার্শনিক ও সহিত্যিক জুল বোওয়া এবং গায়িকা শ্রীমতী কাল্‌ভে। কাল্‌ভের কথাসূত্রেই অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডের কথা উঠেছিল। কাল্‌ভে, সারা এবং অন্যান্য প্রতিভাময়ী রমণীর প্রসঙ্গ থেকে স্বদেশে নারীর ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবনা জেগেছিল তাঁর মনে—

> 'এ দেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও উপায়াভাবে বিফল; বাঙলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল নাটক! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দু'চার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।'[২৫]

আবার, ২৩এ অক্টোবর প্যারিস থেকে বিদায় নেবার একদিন আগে সেখানকার প্রদর্শনী সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

> 'দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আমার জন্মভূমি

২৫। 'পরিব্রাজক', ঐ পৃষ্ঠা ১২০-২১ দ্রষ্টব্য।

—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ-মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে., সি. বোস।'[২৬]

জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর সহধর্মিণী উভয়েরই প্রশংসা আছে এ অংশে। মনে পড়ে, সেকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নানা আলোচনা,—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় মাৎসিনির জীবনী প্রকাশ,—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সংগীত' (১৮৭০),—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ—মনোমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির বিভিন্ন আলোচনা। উনিশ শতকের পুরো শেষার্ধটি আমাদের দেশে জাতীয় মহিমাবোধের সময় ছিল ;—বিবেকানন্দের প্রায় সমকালীন প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র একটি অংশ মনে পড়ে[২৭]। শতাব্দীর শেষ প্রহরে ইউরোপে গিয়েও বিবেকানন্দ সেই 'জাতীয়তার মহাতরঙ্গ' দেখতে পান—

'বর্তমানকালে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে ; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ।'[২৮]

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৪ দ্রষ্টব্য।

২৭। 'আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন বাঙ্গালা দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর patriotism-এর জোয়ার বইতে আরম্ভ করেছে। তাঁরা পলিটিক্সের কোন ধার ধারতেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ যে পরাধীন, এ অবস্থায় তাঁদের মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। আর আমাদের ছোট ছেলেদেরও—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়—রঙ্গলালের কবিতার এই ছত্রটি মুখস্ত করতে হ'ত।'—'আত্মকথা' পৃষ্ঠা ৮৪ দ্রষ্টব্য। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন যে, সেকালে তাঁদের পরিবারে বাইরণ ছিলেন প্রিয় কবিদের মধ্যে গণ্য, কারণ, 'তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন।'

২৮। 'পরিব্রাজক', ঐ, পৃষ্ঠা ১৩২ দ্রষ্টব্য।

এবং য়ুরোপে জাতীয়তার এই সংঘশক্তির আসন্ন আক্রমণাত্মক ভঙ্গির সম্ভাবনাও তিনি 'পরিব্রাজক'-এর এই অংশেই লিখে গেছেন—

> 'বর্তমান অষ্ট্রিয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা, বর্তমান সম্রাট অতি বৃদ্ধ,—সে দুর্যোগ আশু সম্ভাবী।'

'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—দু'টি বইয়েই বৃহৎ মানব-ভূখণ্ডের উত্থান-পতনের ব্যাপক ইতিহাসের অনুভূতি ফুটেছে। রাজনৈতিক ঘটনা, সাহিত্য-সংগীত অভিনয়, শিল্পকলা, দেশাচার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গও এ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অভিজ্ঞ পাঠক এ-লেখাগুলি পড়তে-পড়তে এসব লেখার অনেক পরে রচিত নেহেরুর বিশ্ব-ইতিহাসের দৃশ্যমালার (Glimpses of World History) কথা ভাবতে পারেন। বলা বাহুল্য, জবাহরলাল বিবেকানন্দের বাংলা বইগুলি পড়েননি, কিন্তু তাঁর ইংরেজি আলোচনা প'ড়ে এবং তাঁর কর্মভূয়িষ্ঠ জীবনকাহিনী জেনে নেহেরু নিশ্চয় আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বগামী সমকালীন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের কথা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে স্মরণ করা গেছে। তীব্র জাতীয়তার ভাব শান্তভাবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবার সামর্থ্য ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়,—তিনি তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের নানা দিক পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের বিভিন্ন অবলম্বনের সঙ্গে তুলনা ক'রে গেছেন। হেমচন্দ্রের 'ভারত-সংগীত' তাঁরই সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (৭ই শ্রাবণ, ১২৭৭) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। মনোমোহন বসু সেই সময়ে [২৯] লেখেন—

তাঁতি, কর্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হোলো দেশে কি দুর্দিন।

২৯। 'হরিশ্চন্দ্র', [পৌষ ১২৮১] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' [২য় সংস্করণ], পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬ দ্রষ্টব্য। বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর বৎসর' (১৯৬২) গ্রন্থের ১১২-১৪ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'অবলা-বান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন—

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে
ভারত সন্তান বক্ষ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞানরত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি
আজি সেই পুণ্যভূমি ডোবে গভীর আঁধারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারত-কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সেই ১৮৭০-৮০র মধ্যেই গ্রন্থভুক্ত হয়। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনা আরো বিশ-পঁচিশ বছর পরের ঘটনা। কিন্তু ভারত-অন্তঃকরণের পুরো উনিশ শতকের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার আবেগ এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় তাঁর এইসব রচনায়। 'বর্তমান ভারত' বইখানিতেই শুধু নয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'ও এই ভাবনাই প্রধান ভাবনা। প্রথম প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই এই যন্ত্রণাবোধের চিহ্ন আছে—

> 'সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিত-বদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমশরীর গো-মহিষ বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।'

এই যন্ত্রণার ধ্বনি গম্ভীর। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' প্রথম পৃষ্ঠার পরেই এই গভীর বেদনার সঙ্গে ব্যাখ্যার তৎপরতা এসে যোগ দিয়েছে। তৎসম সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য তাতে ব্যাহত হয়নি বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরল কথ্য-ভঙ্গিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি-প্রকৃতির তুলনা ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। এই প্রবন্ধগুলির প্রধান বিষয়বস্তুই এই তুলনা। এ-আলোচনার দ্বিতীয় নিবন্ধে—'ভারত-সাধকের বিশ্বভাবনা' নামে রচনাটিতে এই মূল বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হ'য়েছে। একালে ভারতবর্ষ নিজের বিশেষ জাতিধর্ম বিস্মৃত হ'য়েছে ব'লেই বর্তমানে তার গভীর দুরবস্থা যাচ্ছে—এই কথাটিই এখানকার প্রধান কথা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নিবন্ধমালার পূর্বোক্ত মূল কথাটিরই বিস্তৃততর কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইখানিতে।

প্রথম প্রকাশের সময়ে, 'বর্তমান ভারত'-এর ভাষাগত জটিলতা সম্বন্ধে

কেউ কেউ অনুযোগ করেন বটে,—সারদানন্দ তাঁর 'ভূমিকায়' সে-কথা লিখে গেছেন (৩, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২); কিন্তু সারদানন্দ নিজেও তা স্বীকার করেন নি। তাছাড়া ঐ ভূমিকাতেই তিনি জানান যে, 'তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ' নিরীক্ষার প্রয়াস ঐ 'বর্তমান ভারত'। ভূয়োদর্শী বিবেকানন্দের ভারতবোধ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাঁর এই দুখানি বইয়ে। সারদানন্দ লিখেছিলেন—

> 'অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখ-দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বন্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতের' আলোচ্য বিষয়।'

বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি তাই একই চিন্তার তরঙ্গবৈচিত্র্য ব'ললে অন্যায় হবে না। আর, তাঁর এইসব রচনার ভাষারীতি সম্বন্ধে সারদানন্দের ঐ ভূমিকারই আর একটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লেখেন—'ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস-সংঘটিত নভেল-নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।'

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে ভাষা-রীতির যে নমুনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী অংশের তুলনা ক'রলেই গভীর আবেগের স্বর কীভাবে যে কৌতুকে পরিহাসে বিতর্কে বিশ্লেষণে বর্ণাঢ্য হ'য়ে ওঠে, তার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন বিবেকানন্দ সেখানে লিখে গেছেন—'এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা, কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।' এ দৃষ্টান্তটি উপস্থিত আলোচনায় আগেও উল্লেখ করা হ'য়েছে, পরে অন্য কারণে আবার উল্লেখ ক'রতে হবে।

'ধর্ম ও মোক্ষ' প্রবন্ধটিতে তিনি এই সহজ ব্যাখ্যানের ভঙ্গিতেই তুলনা-

ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত যে বিশ্লেষণ করেন, তারও নমুনা দেওয়া হয়েছে বর্তমান আলোচনার তৃতীয় পৃষ্ঠায়। 'বর্তমান ভারত'-এর আরো কয়েকটি উক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে এই আলোচনার ৮৩ পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের এতৎপ্রাসঙ্গিক চিন্তার সাদৃশ্যও সে-অংশে ('জীবন-রক্ষা, স্বত্ব-রক্ষা, আত্ম-রক্ষা' নিবন্ধে) সংক্ষেপে আলোচিত হ'য়েছে। এখানে অতঃপর এই কথাই বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, ভারতবর্ষের তামসিকতাগ্রস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তাঁর এই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'ই ব'লেছেন—'আহাম্মক'; ব'লেছেন—'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে',—আরো বলেছেন যে, সব দেশেই 'শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল'—'তবে, ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ কে ? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান।' তাঁর এই 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণের মেজাজে লেগেছে বিশ্বাসের জোর। রাজনীতির চেয়ে মানবনীতি বড়ো,—একথা তিনি খুবই সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন—

> 'মানুষ হও রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি আপনা-আপনি গড় গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর।'

বার-বার ব'লেছেন—'জাতীয় চরিত্র' বজায় রাখতে হবে। শরীর, পোষাক ইত্যাদির ভেদ সবই বাহ্যভেদ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতি-প্রকৃতির পার্থক্য আলোচনার সূত্রেই 'পোষাক ও ফ্যাশন' প্রবন্ধের শেষ কয়েক ছত্রে লিখেছেন—

> 'দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মতো, দেবতাগুলো তো অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তাহলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।'

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভক্ত নরেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। 'প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে'—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম প্রবন্ধেই তিনি একথা জানিয়েছেন।[৩০] কোনো দেশে কোনো কালেই ব্যক্তি ও জাতির ভাবের বিশিষ্টতা উপেক্ষা করা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় নয়।

৩০। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ধর্ম ও মোক্ষ'-তে জাতীয় ভাবের এই বিশিষ্টতার দিকটি পুনরালোচিত

ভারতের সেই বিশিষ্ট জাতীয় প্রকৃতি কি? তার উত্তর আছে পূর্বোক্ত মন্তব্যে—'ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়ো না কেন?'

ভারত-প্রকৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমতাহীন দেশী-বিদেশী খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সম্বোধন ক'রে তিনি এ তিরস্কার করেন। এই সূত্রেই বলেন—'আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।'

জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার এই দিকগুলি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম প্রবন্ধটিতেই এসব কথা বিদ্যমান। এ-প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন—'এমন কোন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোন জাতিতে কোন গুণের আধিক্য—প্রাধান্য।'

অতঃপর এই প্রাধান্য বিচারের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় রচনা 'ধর্ম ও মোক্ষ'তে তিনি আদিতেই স্পষ্টভাবে লেখেন—'আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছা'র প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের'।' অর্থাৎ আমরা চাই 'মুক্তি', ওরা চায় 'ধর্ম'। সুখভোগের প্রবৃত্তিজনিত কর্মই ওদের 'ধর্ম'।[৩১]

হিন্দু-চিন্তায় 'মোক্ষ' শ্রেয় বটে, কিন্তু আগে 'ধর্মপালন' চাই। বৌদ্ধেরা মোক্ষকেই আবশ্যক গণ্য ক'রেছেন; কিন্তু সকলে কি মোক্ষের অধিকারী? এই প্রশ্নটি তাঁর চিন্তায় খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি নানা রচনায় দেখিয়েছেন যে প্রাক্তন, কর্মফল ইত্যাদি ব্যাপার মানতেই হয়,—এসব তুচ্ছ নয়।

যদিও এ-আলোচনায় ইতিপূর্বে মোটামুটি এ সবই উল্লেখ করা হ'য়েছে, তবু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'-এর বিবেকানন্দের তুলনামূলক যে মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা এখানকার বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়, তৎসূত্রেই তাঁর

হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন—'বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, মুসলমান, জৈন—ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্ত সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি-ব্যক্তি প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর ক'রে এক করতে গেলে কি হবে?'

৩১। বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩-৪ দ্রষ্টব্য।

এ-বিশ্লেষণ এখানে পুনরায় স্মরণীয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, সর্বভূতে অহিংসা, —মৈত্রী ও করুণা হোলো মোক্ষের আচরণবিধি; আর ক্লৈব্য পরিত্যাগ ক'রে যশ লাভের সংকল্প গ্রহণই হোলো ধর্মলাভের পথ। কর্মের পথে পাপও আসতে পারে। তা আসুক,—তবু তমোগুণে আবদ্ধ থাকা আর 'জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় প'ড়ে' স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া একই কথা!

'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' প্রবন্ধে বলা হ'য়েছে যে, বৌদ্ধ আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য যদিও অভিন্ন, অর্থাৎ মোক্ষমার্গই যদিচ মানুষের অভিপ্রেত পথ, তবু—'উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে।' ব'লেছেন—'উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়—'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' যেটি বৈদিক ধর্মের—বৈদিক সমাজের ভিত্তি।' এই প্রবন্ধে গুণগত জাতি এবং জন্মগত (বা বংশগত) জাতির পার্থক্য উল্লেখ ক'রে—যথার্থ জাতিধর্ম ব'লতে কি বোঝায়, সেটি উপলব্ধি করবার দায়িত্বের কথা তুলেছেন। ব্যক্তিবিশেষের গ্রামের আচারকেই 'সনাতন আচার' বলা চলবে না। জাতিধর্ম সংকীর্ণতা নয়। ব'লেছেন—'জাতিধর্ম যদি ঠিক থাকে তো দেশের অধঃপতন হবেই না।' পারমার্থিক স্বাধীনতাই যথার্থ 'মুক্তি'—এই বোধই হোলো আমাদের 'জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য।'[৩২] আগে উদ্দেশ্যটা দেখা দরকার, তারপর আচারের আলোচনা। পর পর 'শরীর ও জাতিতত্ত্ব', 'পোষাক ও ফ্যাশন', 'পরিচ্ছন্নতা', 'আহার ও পানীয়', 'বেশভূষা', 'রীতিনীতি' ইত্যাদি নিবন্ধগুলিতে পাশ্চাত্য আচারের সঙ্গে প্রাচ্য আচারের কিছু কিছু তুলনা আছে। 'ইউরোপের নবজন্ম' প্রবন্ধে পৃথিবীর আধিপত্য যে য়ুরোপ-ভূখণ্ডে, সেই য়ুরোপের মহাকেন্দ্র পারি নগরীর দিকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি প'ড়েছে। 'ফ্রান্স ইউরোপের কর্মক্ষেত্র'—উনিশ শতকের এই অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। রেনেসাঁর ঢেউ,—ইটালির নবজন্ম,—ষোড়শ শতকে সারা ইউরোপে প্রাণচাঞ্চল্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে এ-নিবন্ধে। ব'লেছেন—

> 'ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়া শব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময়ে নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর

৩২। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯ দ্রষ্টব্য।

যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইউরোপে ইতালির পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালি জাতিতে সে বীর্য ধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মতো সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে।'[৩৩]

হিন্দু-ভারতের জাতিধর্মের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কথায়-কথায় যুরোপের দেশ-দেশান্তর ঘুরে ফ্রান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অগ্রসর হ'তে দেখা যায় বিবেকানন্দকে। ইটালির প্রসঙ্গে এবং তারপর ফ্রান্সের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তিগুলি সারা উনিশ শতকের ভারতবর্ষের,—বিশেষভাবে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের তৎপ্রাসঙ্গিক চিন্তারই স্মারক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির জাতীয় নেতা ম্যাৎসিনির সংযুক্ত-ইটালির আদর্শেই (*Italia Uni*) 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপিত করেন। আবার, বাংলাদেশে শতাব্দের প্রথম দিকেই রামমোহন ছিলেন ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে মুগ্ধ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি' বইখানিতে সে-কথা জানিয়ে গেছেন। যাই হোক্, 'পারি ও ফ্রাঁস' নিবন্ধে বিবেকানন্দ লেখেন—

'এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ।'

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেশ খুঁটিয়ে দেখেছেন জীবনের বিচিত্র স্তর। 'প্রজাশক্তি' পারি থেকেই জেগে উঠে সারা ইউরোপ তোলপাড় ক'রেছে,—'ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মকশ ক'রছে'[৩৪]—স্কটল্যাণ্ডের

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৪ দ্রষ্টব্য। 'এই সূত্রে স্মরণীয়—'রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জন্মগ্রহণ করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর আদর্শ প্রথম ভারতে প্রচার করেন। ফরাসী বিপ্লবের মতকে তিনি ধর্ম ও সংস্কারে নিয়োজিত করেন। পরে কেশবচন্দ্র সেন এই আদর্শকে

একজন বৈজ্ঞানিক তাঁকে ব'লেছিলেন—'পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র'[৩৫]। আবার, তাঁর সমসাময়িক ফ্রান্সের কথা-প্রসঙ্গে ফরাসীরা 'বিলাসের সপ্তমে উঠেছে' ইত্যাদি উক্তি তাঁর এই নিবন্ধটিতেই বিদ্যমান। লিখেছেন—

> 'লণ্ডন, বর্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাত মোড়া; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাৎ।'[৩৬]

মনে হয়, রোমাঁ রোলাঁ যেমন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারত-প্রকৃতিটি খুঁটিয়ে দেখেছিলেন,—ম্যাক্সমুলার যেমন সুদূর জার্মানীতে বাস ক'রেও ভারত-আত্মার ধ্যানে আকৃষ্ট ছিলেন,—বিবেকানন্দ তেমনি ছিলেন ফ্রান্সের প্রাণোচ্ছলতার মুগ্ধ দর্শক,—প্রবাসী এবং প্রেমিক। কিন্তু শুধু প্রাণোচ্ছলতার দিকই নয়, ফরাসী জাতির হিসেবী মনটিও তাঁর চোখে প'ড়েছিল। তিনি লেখেন—

> 'আমেরিকান জার্মান ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ধাঁ করে সব দেখতে শুনতে পায়। দুচার দিনের আলাপেই আমেরিকান বাড়িতে দশ দিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে; জার্মান তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বহু তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায় ফরাসী পরিবার দেখবার জানবার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়।'[৩৭]

বিশদভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের ভিত্তি-হইতেছে ডেমোক্রাসি, ব্যক্তিত্ববাদ, intuition বাদ। ইহাই ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত বুর্জোয়া আদর্শের ভিত্তি ছিল। কেশব চন্দ্র সেই আদর্শ এই দেশে আনয়ন করিয়া এখানকার নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী মধ্যে রোপণ করেন।'—ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (২য় খণ্ড), বর্মণ পাবলিশিং হাউস (১৯৫৩); পৃষ্ঠা ৩৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৫ দ্রষ্টব্য।

এ সব বর্ণনা কিন্তু কেবলামাত্র দেশভ্রমণের দিনলিপি নয়। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের তথা ফরাসী জাতির 'জীবনোদ্দেশ্য' দেখিয়ে দেওয়া। এই প্রবন্ধটিতেই সে-কথা লিখে গেছেন তিনি—

> 'এসকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির রীতি-নীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুইই ভুল।'[৩৮]

এই তুলনাভিত্তিক আত্মদর্শনই ছিল সমাজচিন্তাশীল ভারত-সাধক বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য। 'পাশ্চাত্যে শক্তিপুজা' নিবন্ধটিতেও এরই নজীর আছে,—যেমন তাতে দেখিয়েছেন আমরা কালী-ঘাটে কুমারী এবং সধবার পুজা করি প্রত্যক্ষভাবে,—অন্যদেশে এই রকম শক্তিপুজাই চলে আর এক ভাবে—এবং ব্যাপকভাবেই—

> 'এ পুজো ইউরোপে আরম্ভ করে মুরেরা—মুসলমান আরব মিশ্র মুরেরা—যখন তারা স্পেন বিজয় ক'রে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়ে। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তি-পুজার অভ্যুদয়। মুর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হ'ল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইউরোপে, 'মা' মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।'[৩৯]

বিশ্বমানবসমাজ সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও সাক্ষাৎ দর্শনলব্ধ এই অভিজ্ঞতা বর্ণনাই 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'-এর মুলকথা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র 'পরিণামবাদ', 'সমাজের ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি শেষ নিবন্ধগুলিতে এই তুলনাভিত্তিক আলোচনারই উপসংহার। যেমন 'পরিণামবাদ' বা ইভলিউশন-সম্পর্কিত অধ্যায়টির প্রথম বাক্যেই দেখা যায়—'যে পরিণামবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মুলভিত্তি, এখন সে পরিণামবাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে।' অর্থাৎ—আমাদের

৩৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯১ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদী জানেন যে জগতের যা কিছু, 'সমস্তই সেই একের বিকাশ'; একেই বলা চলে—'জ্ঞানের চরম সীমা।' আর য়ুরোপে, অ্যামেরিকায়—

'মোদ্দা, এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে [এই 'রকম' প্রয়োগটি বিশেষভাবে বিবেকানন্দীয় বাক্‌ভঙ্গির উদাহরণ], জড়বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে 'এক' কেমন ক'রে 'বহু' হ'ল' একথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি, যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত, এরাও তাই করেছে। তবে সে 'এক' কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতির ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এটার খোঁজার নাম 'বিজ্ঞান।'[৪০]

উভয় সভ্যতার—অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা ক'রে তিনি লিখেছেন—

'অতি বিশাল নদ-নদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতলক্ষেত্র—আর্য-সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।'[৪১]

এবং—

'তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?'[৪২]

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—'ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।'

য়ুরোপ অস্ত্রের জোরে অন্য সকলকে দাবিয়ে রেখে, নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছে; কিন্তু আমরা চেয়েছি—'সকলকে আমাদের

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা ২০০ দ্রষ্টব্য।

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা ২১০-১১ দ্রষ্টব্য।

৪২। ঐ, পৃষ্ঠা ২১১ দ্রষ্টব্য।

সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব।' দুই ভূখণ্ডের এই লক্ষ্য-ভেদের দিকটি দেখিয়ে, তিনি ভারতীয় সমাজে বর্ণবিভাগ-রীতির শ্রেয়ত্বের উল্লেখ করেন। 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধমালায় এই দিকটিই বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করবার আগ্রহ অনুভব করা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর পরিত্যক্ত কাগজপত্রের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূর্বোক্ত তুলনারই অনুসৃতি পাওয়া যায় আরো একটু রচনায়।[৪৩] তাতে তিনি লেখেন—'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত—যেথায় ইউরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ।' অতঃপর ঐ অংশে তিনি 'ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে ক্রিশ্চানধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা' করেন। বিবেকানন্দের ভারত-গৌরববোধ বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে—বিশেষত এই অংশ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান-শক্তির দ্বারা নিপীড়িত ব'লে অনুভব করেন ; যেমন. তিনি লেখেন—

> 'ক্রিশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতেও সমর্থ হয়নি, এবং যখন কনস্টাণ্টাইনের তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোনকালে ক্রিশ্চানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতা বিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, ক্রিশ্চানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্মের অনুমোদিত?'

অর্থাৎ, খ্রীষ্টান ধর্ম য়ুরোপে যেভাবে অনুসৃত হ'য়ে এসেছে, তাতে মানবাত্মার যথার্থ স্বাধীন বিকাশের অনুমোদন অনুপস্থিত,—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি লেখেন—

> 'ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ—ইউরোপের ভল্‌টেয়ার, ডারুইন, বুকনার, ফ্লমারিওঁ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত, অপরদিকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এইসকল পুরুষ আস্তিক, কেবল, ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব।'

৪৩। ঐ 'পরিশিষ্ট', পৃষ্ঠা ২১১-১৫ দ্রষ্টব্য।

ইসলামের প্রশংসা ক'রে তিনি লেখেন—

'ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।'

গদ্যরীতির বিবেচনায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সাহিত্যগুণ তো আছেই, তাছাড়া এই সমাজ-চিন্তার দিকটিও এই নিবন্ধগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। য়ুরোপে আমেরিকায় 'ক্রিশ্চান'-শক্তি আদিবাসীদের ধ্বংস ক'রেছে—এই অভিযোগটি তিনি নানা বাক্যে জানিয়েছেন। তার মানে এ নয় যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান আদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনো অভিযোগ ছিল। 'ঈশানুসরণ' প্রসঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব এ-আলোচনায় আগেই স্মরণ করা হ'য়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ মার্চ সানফ্রানসিসকোতে প্রদত্ত 'শিষ্যত্ব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় তিনি যা বলেন, অথবা অন্যান্য নানা বক্তৃতায় খ্রীষ্ট ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর যেসব মন্তব্য উচ্চারিত হয়, সেসব স্বতই মনে আসে।[৪৪]

অতএব ধর্মের নামে যারা অধর্ম চর্চায় উদ্যোগী হয়, এসব হোলো সেই মানব-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিরস্কার। য়ুরোপে ইহুদীদের দুর্দশা,—স্পেনে প্রাচীন আরবদের,—অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দুরবস্থা ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে তাই বিবেকানন্দ লেখেন—

'আজ যদি ইউরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে পাণ্ডের

(Pasteur) এবং ককের (Koch) ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারুইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইউরোপে ক্রিশ্চানী আর সভ্যতা—আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয় সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহ'লে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হ'ত না এবং সমূলে উৎপাটিত হ'ত; কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই ক্রিশ্চানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু।'

খ্রীষ্টান রাজশক্তির সঙ্গে এইসূত্রেই ইসলাম রাজশক্তির তুলনা ক'রে তিনি আবার ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করেন—

'এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।'

বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে পক্ষপাত বা প্রতিকূলতার কথা নয় এসব। মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি ও ব্যাপক প্রয়োজনের দিক থেকে বিবেকানন্দ তাঁর নানা রচনায় এবং বক্তৃতায় বিভিন্ন ধর্মমতের আদর্শ ও আচরণ সম্পর্কে এই তুলনার চেষ্টা ক'রেছেন। খ্রীষ্টান-সংঘ সম্পর্কে এই দিক থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি লিখেছেন—

'কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্মের অনুমোদিত? ক্রিশ্চানী সংঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের (এই প্রয়োগগুলিও বিবেকানন্দেরই রীতির উদাহরণ), শিল্প বা পণ্য কৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? নিউ টেস্টামেণ্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়।'

এও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র উক্তি। পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম-সংঘের গোঁড়ামি যাই থাক, সেখানকার মানুষ চিনেছে জীবনের ব্যাপক স্ফূর্তির

দাবি। একথাও এগ্রন্থে অনুচ্চারিত থাকেনি। য়ুরোপে তখন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথার্থ শিল্পরুচি ছিল,—শুধু ভোগসুখের তামসিকতা মাত্র নয়—

> 'শুধু ভোগের জিনিস সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায় ('সুচ্ছবি' আর একটি বিবেকানন্দীয় প্রয়োগ)। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়।'

এই রুচি একদিন আমাদেরও ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই,—'চলা-বলা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই।'[৪৫] এই কথা থেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই পৃথক অঞ্চলের শিল্প-রুচির ক্ষেত্রে সাধারণ লোকবাসনার কথা ওঠে। রবি বর্মার কিঞ্চিৎ সমালোচনা দেখা দেয়—

> 'ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি। ও'দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখনা, জগন্নাথেই মালুম! বড্ড জোর ওদের নকল ক'রে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।'

জীবনের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির আকাঙ্ক্ষা নিবেদিতারও সত্তায় নিহিত ছিল। সন্ন্যাসের কঠিন সংযম-শাসনের মধ্য দিয়েও তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হ'তে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। গুরু-শিষ্যার এই আত্মিক যোগের দিকটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

'The Master as I saw him' বইখানির বঙ্গানুবাদ করেন স্বামী মাধবানন্দ। ১৩২২, আষাঢ় থেকে ১৩২৪-এর চৈত্রের মধ্যে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম নৈকট্যের যে স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতি থেকেই, মাধবানন্দের বাংলায়, নিবেদিতার কথা এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা ২১৩ দ্রষ্টব্য।

১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ যখন পর পর দুবার ইংলণ্ডে যান, নিবেদিতা তখনি প্রথম তাঁর বক্তৃতা শোনেন বটে, তবে সে শুধু বক্তৃতা শোনাই নয়, বিবেকানন্দের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ছাপ প'ড়েছিল তাঁর মনে। নভেম্বর মাসের এক রবিবারের অপরাহ্ণে ওয়েষ্ট-এণ্ডের এক বৈঠকখানায় ব'সে, মাত্র পনেরো-ষোল জন শ্রোতার কাছে স্বামীজীর সেই শাস্ত্রব্যাখ্যানের ভঙ্গি,—মাঝে মাঝে মাঝে 'শিব' 'শিব' ধ্বনি উচ্চারণ,—সেই গৈরিক বেশ, মুখশ্রীতে ধ্যানের কোমলতা—নিবেদিতার মনে র‍্যাফেলের সিষ্টীন-চাইল্ড চিত্রটি জাগিয়ে তোলে। সেই আসরে বিবেকানন্দ তাঁর য়ুরোপ-যাত্রার কারণ উল্লেখ করেন——'তিনি বিশ্বাস করেন, জাতিসমূহের মধ্যে, বর্তমানে পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের ন্যায় পরস্পর আদর্শ বিনিময়েরও সময় আসিয়াছে।'[৪৬] তিনি অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা ক'রে,—'আত্মার' তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেন,—বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেন—বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিলেন; 'faith' শব্দটিতে আপত্তি প্রকাশ ক'রে তিনি 'realisation' বা 'উপলব্ধি' শব্দের প্রতি আগ্রহ দেখান,—এবং এইরকম আরো কোনো কোনো কথার মধ্যেই 'society' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর 'সমাজ'বোধ ঠিক্ কী ধরনের—সেই প্রথম পরিচয়ের লগ্নেই, এই 'সোসাইটি' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য ক'রে নিবেদিতার মনে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগে। সভার পরে অনেকে অনেক কথা ব'লেছিলেন। অনেকেই বলেন যে, বিবেকানন্দ নতুন কিছু বলেননি,—তাঁর সেদিনকার বক্তৃতার মূল কথা তাঁরা আগেও নাকি অন্য সূত্রে শুনেছেন। নিবেদিতা নিজেও লিখেছেন—'সমষ্টিভাবে তাঁহার ধর্মগুলিকে আমি সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলাম'[৪৭]—কিন্তু স্বামীজী ইংলণ্ড পরিত্যাগ করবার পুর্বেই তিনি তাঁকে 'গুরুদেব' সম্বোধন ক'রতে পেরেছিলেন। এর কারণও তিনি নিজেই লিখে গেছেন। স্বামী মাধবানন্দের অনুবাদ থেকে সেই অংশটুকু উল্লেখ করা যাক—

> 'সেইবার শীতকালে স্বামিজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা গমন করিবার পর, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা স্মরণ এবং চিন্তা করিতাম—প্রথমতঃ, তাঁহার উদার ধর্মবিষয়ক

৪৬। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (শ্রাবণ, ১৩৬৩), পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য।

৪৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাদীক্ষা; দ্বিতীয়তঃ তিনি আমাদিগকে যে সকল ভাব দিয়াছেন তাহার যুক্তিপ্রণালীর অপূর্ব নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব; তৃতীয়তঃ তাঁহার এই আহ্বান যে মানব-প্রকৃতিতে যাহা কিছু সর্বাপেক্ষা সবল ও সুন্দর, তাহারই প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, আদৌ উহার নীচ ভাবগুলির প্রতি নহে, এই বিষয়টি।'[৪৮]

এই উদার ধর্মমত, নিঃসংশয় বিশ্বাস, প্রত্যয়সাধক যুক্তি-বিচার এবং শ্রেয়ের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র তুলনাভিত্তিক আলোচনার প্রধান আবেদন। 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধমালায় এই মনোভাবটিরই পুনরভিব্যক্তি ঘটে। সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরেই যাঁদের দৃষ্টি আবদ্ধ, বিবেকানন্দের মুষ্টিমেয় বাংলা বইক'খানির মধ্যেও তাঁরা গভীর আন্তরিকতাময় জাতীয়তার ভাবই লক্ষ্য ক'রবেন। যাঁরা সাহিত্যের রীতি, আঙ্গিক ইত্যাদি দিকগুলিই বেশি দেখতে চান, তাঁরা তাঁর শব্দবৈশিষ্ট্য, বাক্‌ভঙ্গি, বাক্যগঠনের রীতি, বাগ্মিতা, পরিহাস্-সরসতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ লক্ষ্য ক'রবেন।[৪৯] কিন্তু সমগ্রভাবে দেখতে হ'লে এসবই উপকরণ মাত্র। তাঁর সাহিত্যকীর্তি মানে একটি পুরো ব্যক্তিত্বেরই স্বাদ! রাজনীতি-সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর সেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এই বইগুলিতে মূলতঃ যা লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধ থেকে সেই দিকগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। ডক্টর মজুমদার লিখেছেন—

'ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজ্‌মের প্রভাব কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সোজাসুজি কিছু না বলিয়া তিনি ইতিহাসের আটটি দৃষ্টান্তের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলিলেন যে, জাতীয়তার ভাব আসে দুইটি কারণে। একটি হইতেছে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতি ও অপরটি হইতেছে অপর কোন জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে।

৪৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৯। এমন কি, কেউ কেউ তাঁর চিত্রকল্প সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'দি বিবেকানন্দ সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'In 'Memoriam' সংকলনে ডক্টর শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'বিবেকানন্দের চিত্রকল্প' প্রবন্ধ [পৃষ্ঠা ৪৬-৪৯] দ্রষ্টব্য।

এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন—"একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব-জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।"

'বর্তমান ভারত'-এর এই উক্তিটি উল্লেখ ক'রে অধ্যাপক মজুমদার লিখেছেন—

'স্বামীজী একবারও বলিলেন না যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বেগ বর্ধিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে একদিকে যেমন "একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য" করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ কোন বিদেশী শাসকের প্রতি "একান্ত বিদ্বেষের" ভাব পোষণ করিতে হইবে। কিন্তু অতগুলি দৃষ্টান্তের মর্ম যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি আর এটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন না?"

অর্থাৎ, বিমানবিহারী যেন এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিবেকানন্দ ভারতোদ্ধারের জন্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ,—তথা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা দিয়ে গেছেন,—এবং এর নজীর হিসেবে তিনি সুভাষচন্দ্রের নাম ক'রেছেন।[৫০] কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রায় সুভাষচন্দ্রকে উদ্যোগী ক'রতে প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের বাণীই সাহায্য ক'রেছে—একথাও এক নিঃশ্বাসে বলা চলে না। কারণ,—আবার উল্লেখ ক'রতে হচ্ছে,—বিবেকানন্দ রাজনীতি-গুরের সাধক ছিলেন না। ইশারউডের যে মন্তব্যটি কয়েক পৃষ্ঠা আগে স্মরণ করা হ'য়েছে, সেটি এখানে পুনর্বার স্মরণযোগ্য। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ভণ্ড ছিলেন না। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত সুভাষচন্দ্রের নিজের কথাগুলিই দেখা যাক্—

'আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামী বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিলনা। তাঁর চোখে এ সব অসহ্য বোধ হোত। বকধার্মিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন, "Salvation will come through football and not

৫০। 'বিশ্ববিবেক', পৃষ্ঠা ২৫৮ দ্রষ্টব্য।

through Gita." নিজে বৈদান্তিক হয়েও তিনি ভগবান বুদ্ধের পরমভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"স্বামীজী, আপনি কি বৌদ্ধ?" তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল. তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কি, বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক—তস্য সেবক।...

এইভাবে তিনি একদিন খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—যীশু খ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়,—বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।'[৫১]

তাঁকে রাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষের অগ্নিযুগের দীক্ষাগুরু ব'লতে হ'লে সমুচিত সতর্ক হয়ে তাঁর নিজের মতামত ভেবে দেখা দরকার। যেমন, তাঁকে বৌদ্ধ বলাও চলে, খ্রীষ্টান বলাও চলে,—তথাপি তিনি বৌদ্ধও ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না। তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কাছে স্বাধীন গতির স্বরাজ পেয়েছিলেন। নিজের শিষ্যদেরও তিনি স্বাধীনতা হরণ করেননি। যিনি যেমন অধিকারী, বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ তিনি সেই ভাবেই ব্যাখ্যা ক'রে নিতে পারেন। অদ্যাবধি সেইভাবেই চ'লে আসছে। অতএব ও-প্রসঙ্গ বিস্তৃত করা অনাবশ্যক। তবে একথা ঠিকই যে, বাংলার রাজনৈতিক সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার যোগ ছিল,—কিন্তু সে ইতিহাস বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরবর্তী অধ্যায়।

স্বামীজীর মরদেহে চিতাগ্নির শিখা দেখে, নিবেদিতা নিজের পরিধেয় বস্ত্রে নিজের মুখ গুঁজে প্রার্থনা করেন—'হে স্বামী, এমন করুন যাহাতে আমার ইচ্ছামত নয়, আপনার ইচ্ছামত আমি কাজ করিয়া যাইতে পারি।'[৫২] আবার, সেই চিতাগ্নি দেখেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মনে বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথ জেগেছিল অন্যভাবে—তিনি মাত্র সাতাশ টাকা পকেটে নিয়ে সেই

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করেন হিন্দু দর্শনের প্রচারব্রতী হ'য়ে। গিরিজাশঙ্কর তাঁর বইয়ে পাশাপাশি এই দুটি ঘটনা উল্লেখ ক'রেছেন।

এসব প্রসঙ্গের এতদধিক বিস্তার এখানে অনাবশ্যক। 'পরিব্রাজক' বইখানিতে তিনি ভারতের শ্রমজীবীর জাগরণ এবং উদ্বোধন দাবি করেন,—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এশিয়ার দীপশিখা এবং বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক আশ্রয় এই ভারতভূমির যথার্থ উদ্বোধন কামনা করেন। আর স্পষ্টভাবে এই কথা জানান যে, ভারতের বর্তমান দুর্গতির কারণ শুধু বিদেশী শাসক নয়, দেশের উচ্চাবস্থিত সমাজও। 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধমালায় বৈদিক কাল,—বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধবিপ্লবের কাল,—ভারতের মুসলমান-শক্তির অধিকার,—ইংলণ্ডের ভারতাধিকার প্রভৃতি স্তর উল্লেখ ক'রে,—বৈশ্যশক্তি, পুরোহিত-শক্তি, ক্ষত্রিয়শক্তি ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে, শূদ্র-জাগরণের কথা লেখেন। এ প্রসঙ্গ এ-সমালোচনায় পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানব-ভূখণ্ডের সংঘর্ষের স্বরূপ দেখিয়েছেন তিনি। 'বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে'—

> 'এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে; 'ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥'[৫৩]

বাংলায় বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্ম ব'লতে প্রধানতঃ তাঁর যে ক'খানি গদ্য-গ্রন্থের আর তাঁর কিছু চিঠিপত্র আর গানের কথা বুঝিয়ে থাকে, সেই লেখাগুলির মূল পরিচয়ের পক্ষে এই পরিচিতিই যথেষ্ট। কিন্তু যে বৃহৎ সত্য রামকৃষ্ণের ধ্যান থেকে রক্তমাংসের মানুষ নরেন্দ্রনাথের সত্তা অবলম্বন ক'রে উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে এই বাংলা দেশেই ব্যক্ত হ'য়েছিল, তার কথা ভাষার অতীত! বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা, সাহিত্য-চিন্তা, নারীর অধিকার-

৫৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, 'বর্তমান ভারত' (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃষ্ঠা ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

চিন্তা,—ব্যাপকভাবে তাঁর সমাজ-চিন্তা অথবা তাঁর দর্শনসূত্র ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড বিষয়ের কথা লেখকমাত্রেরই মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ এসব খণ্ড-প্রসঙ্গের একটিতেও ধর্তব্য নন। রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনপরিচিতি আর নিবেদিতার পূর্বোক্ত গুরুদেবকে যেমন দেখেছি—বই দুখানিই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য উপলব্ধির নির্ভরযোগ্য সংকেত। এই বই দুখানির ওপর নির্ভর ক'রেই মোহিতলাল মজুমদারের মনে হয়েছিল যে, রোলাঁর কথাই ঠিক—'The great disciple was physically and morally his (Ramkrishna's) direct antithesis'। 'পরমহংসদেবের 'কালী' এই জীব হইতে শিবে এবং শিব হইতে জীবে গতায়তির সেতু',—এও মোহিতলালের উক্তি। নিবেদিতার ঐ গ্রন্থ পাঠের ফলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মনে জেগেছিল আশ্চর্য এক আকাশবোধ,—তাঁর নিজের কথায়—'সে আকাশের দিকে যখনই চাহিয়াছি, তখনই নিজ জীবনের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রতারকার সভাতলে আসন পাতিয়াছি।[৫৪]

৫৪। 'বিবিধ কথা'—মোহিতলাল মজুমদার, পৃষ্ঠা ১১২-১৩ দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র-তারকার সভাতল

'চন্দ্র-তারকার সভাতল' একটি আশ্চর্য অলঙ্কার। পৃথিবীর ধূলি-মলিনতায় আবিষ্ট আমাদের মন। এই মনেরই বিস্তার-পিপাসার সংকেত এই রূপক। মোহিতলাল কবি ছিলেন। তাই তাঁর কলমে এরকম একটি উদ্ভাবনা সার্থক হ'য়েছিল।

তিনি অবশ্য পরমহংসদেব সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর ব্যবহৃত আর একটি রূপক ভাবতে ভাবতে ঐ ইঙ্গিতে পৌছেছিলেন। রোলাঁ স্বামীজীর প্রশস্ত কপাল, উজ্জ্বল চোখ, দীর্ঘ ঋজু দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), পেশীদৃপ্ত বাহু, বলিষ্ঠ চোয়াল ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে,—তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন রাজকীয়তার ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে,—তাঁর অসাধারণ প্রেম এবং প্রবল সংকল্পের নানা ইঙ্গিত দিয়ে,[১]—বিবেকানন্দের মর্ত্য সংগ্রামের ব্যাপকতা দেখিয়েছেন। আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯-৯২) ভাবাদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দের বেদান্ত-ধ্যানের সাদৃশ্যের উল্লেখ ক'রে তিনি হুইটম্যানের বন্ধু অজ্ঞেয়বাদী ও জড়বাদী গ্রন্থকার রবার্ট ইঙ্গারসোলের সঙ্গে বিবেকানন্দের এক আলোচনারও উল্লেখ ক'রেছেন। সেটি বিশেষ তাৎপর্যময়। 'চন্দ্র-তারকার সভাতল' সকলের জন্যে নয়! Ingersoll তাঁকে সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। ভাবের রাজ্যও ভেজালহীন নয়। বিভিন্ন ধরনের গোঁড়ামি টিঁকে থাকে ভাবের ভেখ ধ'রে। শিকাগোতে বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দেন, তার বছর-চল্লিশ আগে যদি সেখানে যেতেন, তাহলে ভারতীয় বৈদান্তিককে হয়তো জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হ'তে হোতো,—ইঙ্গারসোলের কথায় তারই ইশারা ছিল।[২] অর্থাৎ তদানীন্তন আমেরিকার গোঁড়ামি সম্পর্কে ইঙ্গারসোল তাঁকে সতর্ক ক'রতে চেয়েছিলেন।

১। 'He was driven to break the ties that bound him, cast off his chains, his ways of life, his name, his body—all that was Naren—and to remake with the help of different ones another self wherein the giant which had grown up could breathe freely—to be born again. This rebirth was to be Vivekananda···It can no longer be described as the religious call of the pilgrim, who bids farewell to his brother men in order to follow God. This young athlete, reduce to death's door by his unused

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ ক'রেই রোলাঁ বেঠোফেন এবং শিলারের নামোল্লেখ করেন। পশ্চিম ভূখণ্ডের প্রতিনিধি হ'লেও এঁরা বিশ্বব্যাপী আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের সে-অভিজ্ঞতা অব্যাহত ছিল না,—অনেক দ্বন্দ্বের মেঘ ছিল; অথচ রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভূমানন্দ-বোধ ছিল নির্দ্বন্দ্ব,—সংঘাতহীন। রোলাঁর উক্তির ইংরেজি অনুবাদে দেখা যায়—'the Paramhansa—the Indian Swan—rested his great white wings on the sapphire lake of eternity beyond the veil of tumultuous days.'[৩]

রামকৃষ্ণের বিস্ময়কর শুচিতা এবং গভীর প্রেম বিবেকানন্দকে বৃহৎ কর্মের উপযোগী ক'রে তোলে। রামকৃষ্ণ লোকান্তরিত হবার পরে পওহরী-বাবার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে ঈশ্বর-পিপাসু নরেন্দ্রনাথ খুবই আগ্রহী হন। পওহরী বাবার কাছে দীক্ষা নিলে তিনি হয়তো ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আনন্দের নীলকান্ত হ্রদে মগ্ন হ'তে পারতেন! কিন্তু গুরু রামকৃষ্ণ পর পর একুশ রাত্রি স্বপ্নে তাঁকে বাধা দেন। ফলে, রোলাঁর উক্তির অনুবাদ অনুসারে—'He chose the service of God in man'। ১৮৯০-এর দশকটি তাঁর এই বৃহৎ কর্মের বিপুলতায় চিহ্নিত। শিকাগো বক্তৃতার পরে মাদুরাইয়ে, রামনাদে তাঁর সংবর্ধনা হয়। তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে এইসব সংবর্ধনার উত্তরে, তাঁর এই কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি, রামনাদের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন—

'Ay, in spite of of the sparkle and glitter of

Western civilisation, in spite of all its polish and its marvellous manifestation of power, standing upon this platform, I tell them to their face that it is all vain. It is vanity of vanities. God alone lives. The soul alone lives. Spirituality alone lives. Hold on to that.'

এই আধ্যাত্মিকতাই জগৎ-সভায় ভারতের প্রদেয় সম্পদ। এ-কথা তিনি আরো অনেক সভায়,—দেশে এবং বিদেশেও বার বার ব'লেছেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে যা অনুশীলনযোগ্য, লোকসাধারণের পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। অতএব সন্ন্যাসী যে ত্যাগের সাধনা দেখাতে পারেন, সাধারণ মানুষের কাছে তা আশা করা অন্যায়। তিনি বলেন—

'Yet, perhaps, some sort of materialism, toned down to our own requirements, would be a blessing to many of our brothers who are not yet ripe for the highest truths. This is a mistake made in every country and in every society, and it is a greatly regrettable thing that in India, where it was always understood, the same mistake of forcing the highest truths on people who are not ready for them has been made of late. My method need not be yours. The Sannyasin, as you all know, is the ideal of the Hindu's' life, and every one by our Shastras is compelled to give up.'

পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ তাতে আচ্ছন্ন হয়নি। তিনি বলেন—

'I am sorry to say that most of the examples one meets nowadays of men who have imbibed the Western ideas are more or less failures.'

রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এই জায়গায় যে, তিনি ভারতবর্ষকে আপন

ঐতিহ্যে, বিশ্বাসে, শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত দেখতে চেয়েছিলেন। ঐ রামনাদের বক্তৃতাতেই তিনি বলেন—

> 'There are two great obstacles on our path in India, the Scylla of old orthodoxy and the Charybdis of modern European civilisation. Of these two, I vote for the old orthodoxy, and not for the Europeanised system; for the old orthodox man may be ignorant, he may be crude, but he is a man, he has a faith, he has strength, he stands on his own feet; while the Europeanised man has no backbone, he is a mass of heterogeneous ideas picked up at random from every source—and these ideas are unassimilated, undigested, uuharmonised.'[8]

বিবেকানন্দ যখন এইসব ভাষণ দেন, তখন দক্ষিণ-ভারতে একটির পরে আর একটি সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে হ'য়েছে। অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে দাঁড়িয়ে, তিনি কৌতুকের সঙ্গে বলেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসীরও শরীর থাকে,—শরীর থাকলেই শ্রমে ক্লান্ত হ'তে হয়! এইসব ভাষণের কোনোটিই তাই অতিদীর্ঘ নয়। মনমাদুরার ভাষণে তিনি বলেন যে, জাতিতে জাতিতে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যেই ঈশ্বর ভারতের ওপর আধ্যাত্মিকতার ভার দিয়েছেন।[৫] মাদুরাতে বলেন—আমাদের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রসঙ্গ আছে বেদে। আর, স্মৃতিশাস্ত্রে এবং পুরাণে আমাদের সাময়িক এবং আঞ্চলিক সম্পর্ক রক্ষার সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সত্যযুগের সঙ্গে কলিযুগের আচার-ভেদ তো স্বাভাবিক। যেখানে বেদের সঙ্গে পুরাণ ও স্মৃতির বিসংবাদ, সেখানে বেদই প্রামাণ্য ব'লে গ্রাহ্য।[৬] তিনি আরো বলেন যে, সামাজিক আবহাওয়ার বদল হয়—ফলে, আচার ব'দলে যায়, কিন্তু তাতে ধর্ম

৪। 'Reply to the Address at Ramnad: The Complete Worke of Swami Vivekananda (Vol. III), পৃষ্ঠা ১৪৫-৫৪ দ্রষ্টব্য।

৫। ঐ 'Reply to Manamadura Address', পৃষ্ঠা ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ পৃষ্ঠা ১৭০ দ্রষ্টব্য।

হারাবে কেন? কোন্‌টা শাশ্বত আর কোন্‌টা অস্থায়ী, সে-তত্ত্ব শান্ত হ'য়ে বুঝতে হবে আমাদের। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই তা' জানিয়ে গেছেন। কী যে শাশ্বত, তা' তাঁদের কথা থেকেই বোঝা যাবে। উপলব্ধি ব্যতিরেকে ঋষি হয় না। ব্যক্তির জীবনে ঋষি হবার সাধনাটি সত্য হোক। কুম্ভকোণমের ভাষণে তিনি বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মই বিশ্বধর্ম হ'তে পারে,—Dr. Barrows-এর এই দাবি মোটেই ঠিক নয়; একমাত্র বেদান্তই বিশ্বধর্ম হ'তে পারে।[৭] বিশ্বকে স্বীকার করাই ধর্মের লক্ষ্য—এই ছিল তাঁর যুক্তি। ভারতবর্ষে হিন্দু পরাধীন এবং নিপীড়িত হ'য়েও খ্রীষ্টানের জন্যে গির্জা,—মুসলমানের জন্যে মসজিদ গড়ে তোলার কাজে বাধা দেয়নি। পরমতসহিষ্ণুতাই তো হিন্দুর আদর্শ। প্রেম ছাড়া ধর্ম হয় না। ১৩৩২-এর ভাদ্রের 'বঙ্গবাণী'তে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ' বলার জন্যে বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যকেও ভর্ৎসনা ক'রে গেছেন। কুম্ভকোণমের এই ভাষণে তিনি বর্ণ-বৈষম্য, জাতি-বৈষম্য, ধন-বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভারতীয় আদর্শের শাশ্বত প্রতিবাদের কথা ব্যাখ্যা করেন। বলেন—আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে একবার অভিযোগ করা হয় যে, তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধেই বেশি ব'লছেন। কিন্তু দ্বৈত চিন্তার গভীর প্রেমানুভূতি তো তাঁর অজানা ছিল না; তবে দেশ তো অনেক কেঁদেছে,—অশ্রুবর্ষণের অন্ত কোথায়? অতএব—আনন্দের আতিশয্যেও এদেশে আর কান্না চাই না,—

> 'What our country now wants are muscles of iron and nerves of steel, gigantic wills which nothing can resist.'

লোহার পেশী,—ইস্পাতের স্নায়ু,—অদম্য মনোবল চাই। অদ্বৈতে আস্থার দ্বারাই এ অবস্থায় পৌছোনো সম্ভব ব'লে তিনি বিশ্বাস ক'রতেন—

> 'And that can only be created, established and strengthened by understanding and realising the ideal of the Advaita, that ideal of the oneness of all. Faith, faith, faith in ourselves, faith in God—this is the secret of greatness.'[৮]

৭। ঐ পৃষ্ঠা ১৮২ দ্রষ্টব্য। ৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯০ দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার একদিকে নিখুঁৎ এই বাস্তব দৃষ্টি, আর অন্যদিকে মোহিতলালের ঐ কবি-বচনে তাঁর সম্বন্ধে 'চন্দ্র-তারকার সভাতল' ইঙ্গিতটির বাচকতা,—মনে মনে এই দুটি বিষয় মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। 'চন্দ্র-তারকা' ব'ললেই আমাদের মনে উদাস কোনো মহাকাশের ধারণা জাগতে পারে। কিন্তু বিবেকানন্দ মোটেই মহাশূন্যবিলাসী ছিলেন না। রোলাঁর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যটি স্মরণীয়—'He chose the service of God in man'। বেদান্তের মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত থেকে, তিনি নিজের দেশ-কালের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হ'য়েই তাঁর ঐ কুম্ভকোণমের বক্তৃতায় বলেন—এখন ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণেরই উন্নয়ন দরকার,—ওহে আধুনিক হিন্দু-সন্তানের দল, তোমরা নিজেদের মোহনিদ্রা দূর করো এবার,—'O ye modern Hindus, de-hypnotise yourselves'। গীতার সর্বাত্মবোধ ('seeing the Lord as the same every where present') উল্লেখ ক'রে, নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে তিনি বলেন যে, সাম্যে এবং ঐক্যে বিশ্বাস থেকেই দেখা দেয় যা-কিছু শুভ—এবং অনৈক্যই অশুভের জনক।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর আলমোড়া থেকে নৈনীতালের এক মুসলমান ভদ্রলোককে তিনি লেখেন যে ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামের দেহ ধারণ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু পূর্বোক্ত কুম্ভকোণমের বক্তৃতায় একথাও তিনি নিজেই ব'লেছেন যে, তিনি তো সমাজ-সংস্কারক হ'য়ে আসেন নি। বিশেষভাবে আমাদের জাতিগত প্রকৃতিটির ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা ক'রতে হবে আমাদের,—এই ছিল তাঁর বক্তব্য—'in the first place we must try to keep our historically acquired character as a people.'[৯]

বিবেকানন্দের ইতিহাস-দৃষ্টি—তাঁর সাহিত্য,—এবং তাঁর সমাজ-চিন্তা,—দু'টি বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই ভারতবর্ষে দেশীয় পণ্যশিল্পের সমৃদ্ধি-লোপ ঘটে,—লর্ড কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, দেশের টাকা বইতে থাকে জমিদারির দিকে; দেশী বেনিয়ানরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র

৯। ঐ পৃষ্ঠা ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

থেকে উচ্ছেদ হ'য়ে যান,—তাঁদের জায়গা নিতে থাকেন ব্রিটিশ বেনিয়ানের দল ; দেশের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের দুরবস্থার ফলে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়।[১০] এ সময়ে বাংলাদেশে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, তাঁরা হয় ভূসম্পত্তি রক্ষায়, নয়তো বিশেষ বিশেষ পেশায় (professions), নয়তো সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। অথচ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের প্রথম দিকেও বাংলাদেশে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মা, ঠাকুর, দত্ত, মিত্র, ঘোষ ইত্যাদি পদবীধারী বাঙালী বেনিয়ানের প্রাচুর্য ছিল।[১১] উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে এঁরা স'রে যেতে বাধ্য হন। ফলে, দেশের চাকুরিসর্বস্ব শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের মতি-গতি সংকুচিত হ'তে থাকে। আবার,দেশে ইংরেজ আসবার আগের আমলে মুসলমান-রাজশক্তির যে কেন্দ্রগুলি ছিল,—যেমন লখনউ, দিল্লি, লাহোর,—সে-সব কেন্দ্রের পরিবর্তে কলকাতায়, বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে ইংরেজদের নতুন কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কেন্দ্রে,—এবং পরে, লখনউ. দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলেও চাকুরিজীবী ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরাই বেশি সুযোগ পান। মুসলমানরা এইভাবে উপেক্ষিত হওয়ায়, হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বিদ্বেষ থেকে ক্রমে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৭০ নাগাদ সরকারী ব্যবস্থাতে ভেদনীতি শুরু হয়।[১২]

১০। The disappearance of domestic handicrafts was a very quick process. Population increased, but manufacturers disappeared. The weavor cum cultivator become merely a cultivater. The *malangi* or salt worker who had his patch of land had to depend entirely on it for his subsistence. Thus was created the greatest under-employment problem. Tens of millions of farmers were doomed to idleness for half the time—there was perhaps less than one acre of land per head of agricultural population. As there was not enough land to go round, there was henceforth a landless proletariat. Rural pauperisation pushed these masses to the plantations or the colonies. In the agrarian economy of India—in the life of the *ryot*—the village money-lender began to play a part which was not less important than that of the Zemindar. The moneylenders were mostly survivors of the old trading classes—the *setts, shroffs* and *chetties*.'—Studies in the Bengal Renaissance'; 'Economic Background of the Century' By Narendra Krishana Sinha, পৃষ্ঠা ৪ দ্রষ্টব্য।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দকে যে ভারতবর্ষ দেখতে হ'য়েছিল,—যেখানে তাঁকে বাস ক'রতে হয়েছে, সে এই ভারতবর্ষ। অবশ্য তাঁর জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই জাতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষণগুলি দেখা দেয়। জ্ঞানে, কর্মে প্রাণোচ্ছলতায় ইতিহাস ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা' নামে বইখানিতে (১৩৭২) অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' থেকে একটি উক্তি উল্লেখ ক'রে এবং তাঁর জাফনা-বক্তৃতা স্মরণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দ নিজে ব'লে গেছেন—'হিন্দু' শব্দে 'আজ আর খাঁটি হিন্দু বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের অধিবাসীগণকেও বুঝাইয়া থাকে।'[১৩] এ-কথা এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ মাত্র করা গেল। তিনি যেখানে জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি মতের সঙ্গে হিন্দুত্বের তুলনা করেছেন, সেখানে এ-অর্থ অচল। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ গৌণ।

আসল কথা 'চন্দ্র তারকার সভাতল' ব'ললে দেশ কালের সম্পর্ক-নিরপেক্ষ যে শাশ্বত মহাকাশের ধারণা মনে জাগে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সে-রকম মর্ত্যসম্পর্কহীন দর্শকের ধারণা ভিত্তিহীন ও অনুচিত। বরং উনিশ শতকে ভারত-সত্তার যথার্থ আত্মবোধ পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন,—এই ছিল তাঁর ভূমিকা।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদেশ থেকে দেশে ফেরবার পরেই ২৭-এ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। সেই অভিনন্দনের উত্তরে তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কথা এইভাবে নিবেদন করেন—

> 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না।···রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা

১৩। 'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা', পৃষ্ঠা ২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।'

তিনি জাতিকে আপন কল্যাণের জন্যই রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত আদর্শ গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ করেন—

'আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি।'

এই গুরুর আদর্শ ভারতকে জগৎজয়ী ক'রবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই সভাতেই তিনি বলেন—

'ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না।...আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে, নতুবা মরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই।'

জীবনের এই বিস্তৃতিতে বিশ্বাস,—এবং এই বিস্তার-অর্জনের সাধনাকেই বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় সাধনা ব'লে গেছেন। 'চন্দ্র-তারকার সভাতল' ইঙ্গিতটির লক্ষ্য এই বিস্তৃতি। আধুনিক ভারতবর্ষে রামমোহনের সময় থেকেই এই লক্ষ্য-চেতনার সূচনা। শোভাবাজারের সেই সভাতেই রামমোহনের উল্লেখ ছিল বিবেকানন্দের ভাষণে—

'আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।'[১৪]

বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা এই বিস্তার-চিন্তারই প্রতিশব্দ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাতেই তাঁর লোক-জাগৃতির চিন্তা প্রবাহিত। বিশ্বপ্রেম ও ব্যাপক জনসেবাই তাঁর আদর্শ। কিন্তু দেশের উগ্রপন্থীরা তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরেন। এদিকে, বিবেকানন্দ নিজে

১৪। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' (প্রথম সংস্করণ) পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪-১৮ দ্রষ্টব্য।

কেবলমাত্র আচারগত-সংস্কারার্থী ব্রাহ্ম মতবাদেও সন্তুষ্ট হন নি, কোঁতের নিরীশ্বর মানবানুরাগেও তৃপ্ত হননি। লোক-জীবনের নানা দিকে তাঁর অভিপ্রেত এই বিস্তারের বৈচিত্র্য সম্প্রতি অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর একটি আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে।[১৫] বিবেকানন্দ জানতেন যে, অন্তরের জাগরণ ব্যতিরেকে লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব। তিনি যা চেয়েছিলেন সে কেবল বাইরের সংস্কার নয়, তিনি ব'লে গেছেন—যথার্থ পরিণতিই আমাদের কাম্য।[১৬]

এই পরিণতির পথে মানুষকে চ'লতেই হবে। তাঁর সাহিত্যে এবং সমাজচিন্তায় এই বিশ্বাস কোথাও ক্ষীণ নয়। এই বিশ্বাসের গুণেই জীবন-সমস্যার ভারবোধ থেকে তিনি মুক্ত। সহযোগী সন্ন্যাসী এবং যাবতীয় শিষ্য, ভক্ত, বন্ধু, বিরোধী—সকলের সঙ্গেই প্রসন্ন আলাপ-আলোচনায় তাঁর কার্পণ্য ছিল না। 'বিশ্ববিবেক' সংকলনে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সহাস্য বিবেকানন্দ' প্রবন্ধটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটি দেখানো হয়েছে। এই আলোকে তাঁকে দেখতে পেলে মনে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, চন্দ্র-তারকার সভাতলেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা

সাকারকে নিরাকারে লীন ক'রতে হবে—এই ছিল প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার প্রতি বিবেকানন্দের নির্দেশ। অদ্বৈতবাদীর এই সাধনলক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের রোগ-শোক-মারীভয়ের,—আশা এবং সুখেচ্ছার,—ধন-যশ-শক্তি-কামনার সাধারণ এই লোকসংসারের আপাতদৃষ্টিতে কোনো মিল নেই। আমরা সাকারত্বে, সীমাচেতনায়, সুখে-দুঃখে আবদ্ধ জীব। আমাদের রাজা-প্রজার সম্পর্ক, ধনী-নির্ধনের সংঘর্ষ—আমাদের শিক্ষার অভাব, জাতিভেদের গ্লানি ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের অতৃপ্তি দূর ক'রতে হ'লে কোন্ বিশেষ উপায় যে স্বীকারযোগ্য—এবং বিবেকানন্দ সে-রকম কোনো উপায় দেখিয়ে গেছেন কিনা, এই চিন্তাই স্বাভাবিক।

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার ধারা অনুভব ক'রতে গেলে আদিতেই তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বৃহত্তর পরিবেশগত তাড়নাগুলির কথা মনে আসে। তিনি যে বাল্যকালেও সাধারণ বালকের মতন ছিলেন না,—তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবেশ-চেতনারও যে প্রত্যাশিত বিস্তার ঘটে,—গত শতকে 'রিফর্মার', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা ও প্রগতিপন্থী সংস্কার ধারাতেই—ক্রমে অষ্টম দশকে—অর্থাৎ ১৮৭০ থেকে ১৮৮০র মধ্যে, কেশব সেন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কর্মময়, বক্তৃতাময় প্রহরে তাঁর কৈশোর উদ্‌যাপিত হয়,—হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্রের কাছে তিনি বার বার গেছেন,—১৮৮০র-দশকের প্রথম দিকেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৮২),—এবং ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা নিয়ে প্রথমে তিনি যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে,—তারপর যান রামকৃষ্ণের কাছে,—এসব প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার তৃতীয় নিবন্ধে ('অন্বয়দৃষ্টি ও আত্মসন্ধান' পৃষ্ঠা ৮-৯) উল্লেখ করা হ'য়েছে। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬, মোট এই চার-পাঁচ বছর রামকৃষ্ণের গভীর সান্নিধ্যের কাল গেছে তাঁর জীবনে। ১৮৭০-এর দশকেই 'ইণ্ডিয়া লীগ', 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি দেখা দেয়,—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫তে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বেরিয়েছে ইতিমধ্যে।

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার সঙ্গে এইসব পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত ভাবটিও বিবেকানন্দের চরিত্রের পরিচিত লক্ষণ।

'জীবই শিব'—এই আদর্শের সম্যক্ চর্চাই তাঁর সমাজ-চিন্তার ভিত্তি। মনুষ্যজীবের সম্যক জাগৃতির জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা—যথার্থ মানবত্বের শিক্ষা।[১] উনিশ শতকের সূচনা থেকেই এ-দেশে শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার তরঙ্গ দেখা দেয়। দেশের ঐতিহ্য এবং দেশের সংস্কৃত-শিক্ষা উপেক্ষা না ক'রেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভাষা ইত্যাদি শিক্ষার প্রচলন যাতে অব্যাহত হয়, রামমোহন থেকেই সে চেষ্টার সূত্রপাত ঘটে। মধ্যযুগের পরে সেই আমাদের আধুনিকতার সূচনা।

সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের উনিশ শতকের মনীষী মাত্রেই শিক্ষা-বিস্তারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মাতৃভাষার গৌরব, স্ত্রী-জাতির অধিকার, মনুষ্যত্বের সমুচিত মর্যাদা,—ধর্মের প্রতিষ্ঠা,—সর্বোপরি জাতীয়তার নবোন্মেষ ইত্যাদি ছিল সেই উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ-চিন্তার স্মরণীয় উপাদান। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বল সঞ্চারের আয়োজনে তখন বেন্থাম, মিল, কোঁত, হিউম, পেইন প্রভৃতি ছিলেন বিদ্বজ্জন-গৃহীত পাশ্চাত্য চিন্তানায়ক। এঁদের সামাজিক চিন্তার মূলকথা ছিল যুক্তিবাদ,—বিবিধ কল্যাণকর্ম ও সেবার উদ্যম। বিবেকানন্দ এই ধারাতেই আবির্ভূত হন। তবে, তিনি ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী ; তাঁর বিশেষত্ব তাঁর অদ্বৈত উপলব্ধিতে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আপন পথে এগিয়ে যেতে দেবার শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা—এই ছিল তাঁর মত। 'যত মত, তত

১। 'বুদ্ধ যাহাকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে নির্বাণমুক্তির অভয়লাভ করিতে বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট তাহাকেই সঞ্জীবিত করিয়া ক্ষমা ও তিতিক্ষার অনুশীলনে পাপমুক্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। চৈতন্য অহৈতুকী শ্রদ্ধা প্রীতির সাধনা করিতে বলিয়াছিলেন—কামকেই ইন্দ্রিয়লোক হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। কেহই মানুষকে বড় করেন নাই, মানুষের মনুষ্যত্বের দায়কে সাক্ষাৎভাবে তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছিলেন।...কিন্তু এবার প্রেমের নূতন অর্থ হইল—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবের মধ্যেই শিবের সাক্ষাৎকার।...আমার মনে হয়, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত নব ধর্মের সার সত্য।' —বিবিধ কথা (১৩৪৮), 'শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ' : মোহিতলাল মজুমদার, পৃষ্ঠা ১০৭-৮।

পথ'—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি মানুষের পরম লক্ষ্যের দিক থেকেই সমস্যার পর্যালোচনা করেন—আত্মবিস্মৃত পাশ্চাত্য-শিক্ষাগর্বিতের মতো নয়।

তাঁর ইতিহাস-অধ্যয়নের রুচির দিকটিও বিবেচ্য। ইতিহাসের চেতনা একটি বৃহৎ ব্যাপার। আধুনিক কালে এদেশে এ-চেতনারও সূচনা রামমোহনের সক্রিয় আত্ম-জিজ্ঞাসায়। এ ক্ষেত্রেও আমাদের উনিশ শতকের মনীষীমাত্রেই ছিলেন ইতিহাস-অনুরাগী মানুষ। বিবেকানন্দের সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda, Patriot and Prophet' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, পিতা বিশ্বনাথ দত্তের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ রোমের ইতিহাস, জুলিয়াস সীজারের জীবনী, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের জীবনী ইত্যাদি ছিল। কলেজের ছাত্রাবস্থায় বিবেকানন্দ গ্রীনের লেখা ইংরেজ-জাতির ইতিহাস এবং য়ুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পড়েন। এসব তথ্য সুপরিচিত। 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার 'স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ' প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই তথ্যগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সেই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে স্মরণযোগ্য—

> 'সে সময়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতীয়দের গবেষণা অতি সামান্যই বাহির হইয়াছিল। সুতরাং স্বামীজীকে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সন্ধান করিবার জন্য বেদ-পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি উৎসের নিকট পৌঁছিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে বিদেশাগত ট্রাইবগুলির জাতিতত্ত্বের কথা বলিতেছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে গঙ্গার গতিপরিবর্তনের বিবরণ লিখিতেছেন, বেদ-উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; অন্যদিকে গ্রীক ও রোমান্ জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় হইতে ও আরব এবং মুরজাতির দিগ্বিজয় কাহিনী হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের সমর্থন

করিতেছেন। বাবিলন, আসেরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইনের ইতিহাস জানিবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি ফরাসী মাস্‌পেরোর লিখিত সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাস ইংরাজী অনুবাদ হইতে প্রথম পড়েন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অনুবাদক গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিয়া মাস্‌পেরোর যেসব উক্তি খ্রীষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে যাইতে পারে সেগুলি তিনি বর্জন অথবা পরিবর্তন করিয়াছেন, তখন তিনি মূল ফরাসী ভাষা হইতে উহা অধ্যয়ন করিলেন।'

বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ও চিন্তার শক্তি অসাধারণ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁর ভাষণ ও রচনাগুলি পাঠ ক'রে অর্থগ্রহণ ক'রতেই ন্যূন পক্ষে দশ বছরের সজাগ, সতেজ আয়ুষ্কাল উদ্‌যাপিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত। অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেনের যে বইখানির আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তার ভূমিকায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

'ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে জাতীয় জীবনের রথের চক্র চলেছে—রাজনীতিক ইতিহাসের সুপরিচিত কার্য-কারণ সম্পর্কের দিক থেকে বিচার না ক'রে ধর্মের উন্নতি ও অবনতির দিক থেকেই তিনি তার ব্যাখ্যা ক'রেছেন।'

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেনের গ্রন্থে এবং বিমানবিহারীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে বহু তথ্যের সমাহার ও অন্বয় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে। আবার 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সোশ্যালিজম্' আর একটি অবশ্য-পঠনীয় প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটির প্রথম কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা বর্তমান লেখকের সাধ্যাতীত। সতীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"অনেকের মতে বিবেকানন্দ ছিলেন 'হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট'। সরকারী মার্কস্‌বাদীরা অর্থাৎ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিকেরা মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন করেছেন। বিবেকানন্দের ধর্মমত ও সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী প্রভৃতি আলোচনা ক'রে এসব তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সামগ্রিক বিচারে

> বিবেকানন্দকে প্রগতিশীল ঐতিহ্যের স্রষ্টা বলা চলে না। আবার উনবিংশ শতাব্দীর উপর অনুশীলন করেছেন এমন অন্য অনেকের মতে বিবেকানন্দ "জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক" ছিলেন।'

এই 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক' কথাটিই বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার মূলে উপস্থাপিত ক'রলে অন্যায় হয় না। তবে অদ্বৈতবাদীর 'সাকারকে নিরাকারে' লীন করবার সাধনার সঙ্গেই তাঁর এই দেশপ্রেম জড়িত ছিল—এবং তা বিশ্বপ্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে তাঁর সমাজ-চিন্তার কথা ভাবতে গেলে, বেদান্তের ব্যবহারিক চর্চার দিকটি স্পষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আপাত-প্রতীয়মান একরকম অসংগতির ধারণা জেগে ওঠে। জাতীয়তাবাদীর আবার বিশ্বপ্রেম কী ক'রে সম্ভব? ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর আবার দেশপ্রেম? তাও কি সম্ভব? এ সংশয় অনেকেরই ঘটেছে। ইতিপূর্বে এই সংশয়ের দিকটি এ-সমালোচনায় অনেক সূত্রেই উত্থাপিত হয়েছে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর আলোচনা উল্লেখ করা গেছে। নিবেদিতা প্রথম যখন বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনেন, তখন তাঁরও মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু যাঁরা যথার্থ জিজ্ঞাসু, তাঁরা প্রত্যেকেই আপন-আপন সামর্থ্য অনুসারে এই প্রশ্ন-কণ্টকিত পথ উত্তীর্ণ হ'য়ে এক-একরকম বিশ্বাসে গিয়ে পৌঁছেছেন। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী বলেন—'religion is the manifestation of divinity already in man'। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনে 'Practical Vedanta' নামে পর পর তাঁর চারটি বক্তৃতা দেন। দর্শনশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক লিখেছেন—

> 'উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'-তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ এইভাবেই আমরা লক্ষ্য করি স্বামীজীর কর্মে ও আদর্শে। স্বামীজী স্বয়ং এর নাম দিয়েছেন 'Practical Vedanta' বা ব্যবহারিক বেদান্ত।'[২]

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষ দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রদত্ত বিশ্বধর্ম

সম্পর্কে বক্তৃতায় তিনি বিভিন্ন মানব-সংসারের চিত্তস্বভাবের উল্লেখ ক'রে বলেন—'Our watchword, then, will be acceptance and not exclusion'। তাঁর সমাজ-চিন্তার মূল কথা এই সহিষ্ণুতা এবং সর্বগ্রাহিতা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধিই এই মানসিকতার অবলম্বন। তিনি বলেন—'What I want to propagate is a religion that will be equally acceptable to all minds; it must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic, and equally conducive to action.'[৩]

এই সর্বমত-সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গেই, সমাজ-স্বাস্থ্যের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে লোকসাধারণের ব্যবহারিক জীবনের,—তাঁদের প্রাত্যহিক আচার-আচরণের ব্যবধান সম্বন্ধে চিন্তা দেখা দেয়। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মনে পড়ে। বিবেকানন্দ যখন লোকান্তরিত হন, তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হ'য়েছে; রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সম্পর্কিত আলোচনারও সূত্রপাত হয়েছে; এবং হিন্দুমতবাদ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধও প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তাও অতঃপর তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়। তবে 'শিক্ষার হেরফের' ১২৯৯ সালের পৌষের ঘটনা। এই প্রবন্ধটিতে তিনি ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধক শিক্ষার দাবি জানান। 'আত্মশক্তি ও সমূহ' গ্রন্থের 'নেশন কী' (১৩০৮, শ্রাবণ), 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (ঐ), এবং আরো কয়েকটি রচনা এই সময়ের পূর্ববর্তী। 'রাজাপ্রজা'র 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৩০০), 'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১), 'কণ্ঠরোধ' (১৩০৫)—বিবেকানন্দের মৃত্যুর পূর্বেই প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' সম্পর্কিত রচনাগুলির চিন্তা দুই শতাব্দীর সন্ধিকালে তাঁর মনে উদ্গত হয়,—তবে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১৩০৯ সালের ভাদ্রের রচনা,—বিবেকানন্দ তার অল্প আগেই লোকান্তরিত হয়েছেন। 'ব্রাহ্মণ' এবং 'চীনেম্যানের চিঠি'—দুটিই ১৩০৯-এর আষাঢ় মাসের রচনা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠে—

৩। 'The Ideal of a Universal Religion', The Complete works (Vol. II) পৃষ্ঠা ৩৮৭ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ বিবেকানন্দের মৃত্যুর এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থনামের সঙ্গেই শুধু নয়, বক্তব্যের সঙ্গেও এই প্রবন্ধের সাদৃশ্য স্বীকার্য। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> 'ইতিহাসের কোন্ গূঢ় নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে, তখন ধ্বংস অদূরবর্তী হয়।'

বিবেকানন্দের কথা লোকসাধারণের শ্রুতিগোচর হোক্ বা না হোক্,—ভারতবর্ষের শাশ্বত জাতীয় ভাবের বিশিষ্টতা,—এবং তাঁর নিকট কালে সেই ভাবের বিচ্যুতি,—এই দুই দিকই তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর বিশ্বমানবানুরাগ,—সর্বধর্মসহিষ্ণুতা ইত্যাদি দিকগুলি আগেই দেখা গেছে। এখানে এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রাথের প্রায় সমকালীন মন্তব্যগুলি দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে লেখেন—

> 'হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু-সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।'

এবং—

> 'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতি-ধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল…।'

রবীন্দ্রনাথের 'বারোয়ারি মঙ্গল' প্রবন্ধটিও বিবেকানন্দের মৃত্যুর পূর্বে ১৩০৮ সালের চৈত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি লেখেন—

> 'চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে—গৃহে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।'

বিবেকানন্দের ইতিহাস-পর্যালোচনা এবং সমাজ-চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য। অথচ উভয়ে উভয়ের সম্বন্ধে প্রধানতঃ নীরব থেকেছেন।[৪] দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা পরস্পরের সমকালীন, এবং প্রত্যেকেই বৈদিক সাধনার সত্যে বিশ্বাসী। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের একাধিক উক্তিতে তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনীর' চতুর্থ খণ্ডের 'সংযোজন' অংশে রবীন্দ্রনাথের ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে এই রকম একটি উক্তির উল্লেখ ক'রেছেন। আর, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের মধ্যে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভেদের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> 'It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude toward truth is different. Truth cannot afford to be tolerant

---

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৫০৭) লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চর্যভাবে উদাসীন। একের সমসাময়িক রচনার মধ্যে অন্যের উল্লেখ নাই।' এই লেখারই পাদটীকায় ১৩০৮ সালের আষাঢ়ের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' গ্রন্থের 'সমাজভেদ' প্রবন্ধটি থেকে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য উদ্ধৃত হয়—"বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র।" অতঃপর স্বামীজীর তিরোধানের ছ' বছর পরে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে ব্যক্ত ('প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশও প্রভাতকুমার স্মরণ ক'রেছেন—"ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে।" ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ধর্মমহাসভার সভাপতির ভাষণ দেন। প্রভাতকুমার এই ঘটনারও উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি আরো লিখেছেন—"যে 'আর্যামি'কে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ কোনোদিন তাহাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কঠোর ভাষায় আর্যামিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন ('ভাববার কথা')।...উভয়েই জাতিকে শুভশ্রী ও রজোগুণসম্পন্ন হইবার জন্য বারে বারে বলিয়াছেন।"

where it faces positive evil; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible.'

পূজায় পশু-বলির প্রথা সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গেই বিবেকানন্দের এই শুভ-অশুভের সীমা উত্তরণের চকিত উল্লেখটুকু পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গ এতদধিক বিস্তৃত করেন নি। অতএব সে কথা থাক।

অতঃপর শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পূর্বালোচিত উক্তির পরবর্তী কথাগুলি দেখা দরকার। তিনি আরো লিখেছেন—

"বেসরকারী মার্কসবাদীরা বলেছেন যে, বিবেকানন্দ যে শুধু জাতীয়তার উদ্গাতা তাই নয়, ভারতের প্রথম সোস্যালিস্টও বিবেকানন্দ। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দের সমাজ-বিষয়ক, ধর্মবিষয়ক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য মতামতের বিশ্লেষণ করেছেন। ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দ 'patriot and prophet', তদুপরি ভারতের প্রথম সোস্যালিস্ট। সরকারী মার্কসবাদীদের সমালোচনা করে ডাঃ দত্ত লিখেছেন :

Now-a-days the youngmen imbued with a smattering of Marxism call him a 'reactionary'. In his lifetime the social reformers of the day called him a reactionary as well; because he did not advocate that only by giving widows to remarriage or by making some inter-caste marriages and such like social reforms India's regeneration would be achieved. The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity.'[৫]

এই তথ্যগুলির উপস্থাপনা অনিবার্য। সতীন্দ্রনাথ এ সব স্মরণ ক'রে নিজেই জানিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের মধ্যে হিন্দুচিন্তার নবপ্রতিষ্ঠা সাধনের

৫। 'বিশ্ববিবেক', পৃষ্ঠা ২৮১ দ্রষ্টব্য।

উপাদান নিঃসন্দেহে বিদ্যমান এবং তাঁর মতো "মহৎপ্রাণ অকুতোভয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় রাজনীতিতেও দুর্লভ—এবং একথাও সত্য যে স্বামীজীই ভারতের প্রথম সচেতন সোস্যালিস্ট।" কিন্তু 'ধরাবাঁধা ছকে ফেলে' তাঁকে বোঝবার চেষ্টা দুরাশা।

সতীন্দ্রনাথের একথাও পুনরুচ্চারণ-যোগ্য যে—'স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের চাইতে দু'বছরের ছোট ছিলেন আর গান্ধীজীর চাইতে দু' বছরের বড়,…স্বামীজী এই দুই মহামনস্বীর সমকালীন হ'লেও অনেকখানিই ইতিহাসের উপেক্ষিত হ'য়ে রইলেন—

> 'স্বামীজীর স্বল্পপরিসর জীবনের সক্রিয় নেতৃত্বের কাল শুধু পাঁচটি বছর। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফেরেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০২, এই পাঁচ বছরে, স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারী হয়ে উঠলেন, নতুন জ্ঞান-কর্মযোগে স্বদেশবাসীকে দীক্ষা দিলেন।'[৬]

১৮৮৫তে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু সতীন্দ্রনাথের কথায়—

> '১৯০২ খ্রীস্টাব্দের আগে কোনও সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন নানাভাবে বাংলার তথা সারা ভারতের চিত্তভূমিকে সরস করে তুলেছিল, সেই আন্দোলনের সূত্রপাতও বিবেকানন্দ-প্রয়াণের কয়েক বছর পরে। অথচ স্বামীজী জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের যে অঙ্কুর বপন করেছিলেন, সেই অঙ্কুর থেকে অগ্নিযুগের মুক্তিসাধনার বিশাল মহীরুহ উদ্গত হয়েছিল।'

দেশের সর্বস্তরের মানুষের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরী,—প্রাথমিক, মধ্য বা উচ্চ, বিবিধ শিক্ষাবিধির চিন্তায়,—বুদ্ধি-বিচারের স্তরে বিদ্যমান থেকে, শিক্ষাক্ষেত্রের সংগঠক ছিলেন না বিবেকানন্দ। তাঁর স্বল্প আয়ুর বিচিত্র নিয়োগের ফলে তাঁর পক্ষে বিদ্যাসাগর বা ভূদেবের মতো শিক্ষাক্ষেত্রের সংগঠনে একনিষ্ঠ থাকাও সম্ভব হয়নি। ঈশ্বর দর্শনের সত্য থেকেই তিনি সামাজিক কর্মে তাড়িত হন। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধে অথবা অন্য কোনো ধর্মভেদে তাঁর

৬। ঐ পৃষ্ঠা ২৮২দ্রষ্টব্য।

পথ ব্যাহত হয়নি। ধর্মের আচার-বিধির নিখুঁৎ তালিকা প্রস্তুত করবার কোনো সংকল্পই ছিল না তাঁর। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি জাগিয়ে তোলবার ব্যাকুলতাই তাঁর সারা জীবনের বৈশিষ্ট্য। মহম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর যে ধারায় অভিব্যক্ত, বিবেকানন্দের অভিব্যক্তিও সেই একই ধারায়। নিবেদিতা লিখে গেছেন—

> 'Mohammad, Krishna, Buddha, Shankaracharya are not so many deplorable obstacles in each other's paths, but rather widely separated examples of a common type—the radiant Asiatic personage, whose conception of nationality lies in a national righteousness, and whose right to be a leader of men rests on the fact that he has seen God face to face.'[৭]

এই সর্ব-সমন্বয়ের চরিতার্থতাই ভারত-আত্মার বাণী। নিবেদিতা দেখিয়েছেন যে, এটি সারা এশিয়া মহাদেশের প্রকৃতি। প্রাচ্য ভূখণ্ড মানসিকতায় স্থবির নয়। যুগে যুগে এর যোগ্য সংস্কারমাত্র ঘটে যায়। নিবেদিতার কথায়—

> 'It is a popular superstition that the East stands still. Children observe no motion of the stars. But the fact is that one generation is no more like another at Benares than in Paris. Every saint, every poet, adds something to the mighty pile which is unlike all that went before.'[৮]

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতেও যেমন, আধুনিক ভাষাগুলিতেও তেমনি এই একই মহাসমন্বয়ের বাণী ব্যক্ত হয়েছে। বাংলায় চৈতন্য,—পাঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায়ের দশ গুরু,—মহারাষ্ট্রে তুকারাম,—দক্ষিণে রামানুজ—

আপন আপন কালে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এই একই জাতীয়-দর্শনের প্রতিনিধি; এবং শুধু ভারতেই নয়,—নিবেদিতার কথায়—'And far away in Arabia, Islam formed itself in the same fashion. For the law that we are considering is not peculiar to India; it is common to the whole of Asiatic life.' । নিবেদিতা অবশ্য এইখানেই থামেন নি। তিনি বলেছেন—'ভারতীয় চিন্তা' কথাটার মানে হোলো সারা এশিয়ার ধ্যান—এবং যীশু খ্রীষ্টও যে এশিয়ার মানুষ, তাতে সন্দেহ কোথায়?[৯]

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা তাঁর 'সর্বদা-সমাধিস্থ থাকবার' মূল বাসনারই গুরু-প্রণোদিত রূপান্তর ব'ললে অসংগত হবে না। জীবে-শিবে অভেদজ্ঞান থেকেই তিনি হন মানবানুরাগী। মানুষের আত্মবোধ জাগাতে হবে—ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরেও এই ছিল তাঁর প্রধান কর্মনিয়োগ। মাতৃভাষার সমাদর,—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার,—বিজ্ঞানের স্বীকৃতি,—সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ লোকোন্নয়ন,—সমাজে নারীর সমুচিত মর্যাদার প্রতিষ্ঠা,—ভারতের আধ্যাত্মিক চরিত্র বজায় রেখে এদেশে ইংরেজ-শাসনের সুফলের দিকটির স্বীকৃতি—ইত্যাদিতেই তাঁর সমাজ-চিন্তার বিভিন্নতা ব্যক্ত হয়েছে।

বেদান্ত থেকে জাতীয়তাবাদে পৌঁছবার পথ যাঁদের কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হয়, তাঁরা সতীন্দ্রনাথের রচনার পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে নিবেদিতার ব্যবহৃত 'Cosmo-nationality'[১০] শব্দটি অন্বিত ক'রে দেখলে সুখী হবেন।

পাশ্চাত্য দেশের উপকরণ-সম্ভারের জৌলুষে অন্যদেশের আত্মবিস্মৃত সন্তান নিজের দেশাচার নিন্দা ক'রতে পটু,—এ দৃশ্য কে না দেখেছেন? পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সে-রকম নানা 'স্নবে'র বিরুদ্ধেই বিবেকানন্দ যুদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর সমাজ-চিন্তার এই দিকটিও স্মরণীয়। নিবেদিতা লিখেছেন—

'Cosmo-nationality of thought and conduct,

৯। 'India is the heart of Asia. Hinduism is a convenient name for the nexus of India thought.'—ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৯ দ্রষ্টব্য।

১০। ঐ, তৃতীয় খণ্ড; পৃষ্ঠা ৫১৫ দ্রষ্টব্য।

is not easy for man to reach. Only through a perfect realisation of his own nationality can any one, anywhere win to it. And cosmo-nationality consists in holding the local idea in the world idea. It is well known that culture is a matter of sympathy, rather than of information. It would follow that the cultivation of the sense of humanity as a whole, is the essential feature of a modern education.'[১১]

বিবেকানন্দের সমকাল থেকে অতিক্রান্ত দু'পুরুষের মধ্যে দেশে একরকম বিহ্বলভাব গেছে বলে নিবেদিতা মন্তব্য করেন।[১২] তখন পাশ্চাত্য জগৎ যা-কিছু পাঠিয়েছে, ভারত তাই-ই মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণার যুগোচিত ভারতীয়-করণের কাজ শুরু হয় অতঃপর। সমাজচিন্তায় বিবেকানন্দের এই যুদ্ধের দিকটি ভোলবার নয়। এবং গুরুর প্রচুর আন্তরিকতাময় কাজ দেখেই প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা লিখেছিলেন—

'The history of India has yet to be written for the first time. It has to be humanised, emotionalised, made the trumpet-voice and evangel of the races that inhabit India.'

তিনি বলেন—'Great literatures have to be created in each of the vernaculars'; বলেন—'Art must be reborn'—এবং—'Not only to utter India to the world, but also to voice India to herself.—this is the mission of art, divine mother of the ideal, when it descends to clothe itself in forms of realism.'[১৩]

সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, ঐক্যে প্রত্যয়ী,—এবং বিজ্ঞান-সচেতন এক সমাজ

১১। ঐ।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ৫১৬ দ্রষ্টব্য।

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৫১৯ দ্রষ্টব্য।

না গ'ড়ে উঠলে যথার্থ আধুনিকতার সঙ্গে যথার্থ ভারতীয়তার অভিপ্রেত যোগটি সম্ভব হ'তে পারে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে যাঁদের অল্পবিস্তর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, আত্মস্থতাকামী সেই গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয় দলই সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসে আশ্রয় পান। এদিক থেকেও বিবেকানন্দ সারা শতাব্দীর সঙ্গে যুক্ত,—তিনি বিচ্ছিন্ন নন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র,—'ইয়ং বেঙ্গল' দল,—ব্রহ্মবান্ধব, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ইত্যাদি অনেকের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক সংকোচ এবং জড়তা দূর করবার যে সংকল্প এগিয়ে এসেছে, বিবেকানন্দ সেই ধারাতেই বিদ্যমান। তখন একই পরিবারে এক সন্তান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন বা পাশ্চাত্য আচারের ভক্ত হয়ে উঠেছেন,—আবার আর একজন দ্বিধা জয় ক'রে যথার্থ ভারতীয় ঐতিহ্য বরণ ক'রেছেন,—এরকম দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অভেদানন্দের বড়ো ভাই বিহারীলাল চন্দ্র আর তিনি নিজে—কালীপ্রসাদ চন্দ্র, দুজনে দুই বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৪]

জাতি-মানসের এই দ্বিধা দূর করবার উপায়ই এ সময়ের সমাজ-চিন্তার মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'চিত্তশুদ্ধি'র নীতি ঘোষণা করেন। হৃদয়ে শান্তি,—মনুষ্যে প্রীতি—এবং ঈশ্বরে ভক্তি—এই ছিল তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি'র ইঙ্গিত। ১২৮৩ সালে লেখা 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—'সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য।' এই 'সম্যক অনুশীলনে'র ব্যাখ্যা বা উদাহরণের ইশারা ছিল

তাঁর আরো কয়েকটি রচনায়। ১২২৮ সালের রচনা 'রামধন পোদ;—১২৮৫র প্রবন্ধ 'লোকশিক্ষা' ইত্যাদি এইরকম ব্যাখ্যার উদাহরণ। সমুচিত শিক্ষা,—যোগ্য সময়ে এবং উপযুক্ত অবস্থায় বিবাহ,—মনের সার্বিক বিস্তার ইত্যাদিই তাঁর সমাজ-উন্নয়ন-চিন্তার সোপান। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং লেখেন—'তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরণে বুঝাইয়াছি'। অনুচিত বিবাহের তিনি যে বিরোধী ছিলেন, 'রামধন পোদ' প্রবন্ধেই তার নজীর আছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত আনুকুল্য তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করেননি। আবার তাঁরই সমসাময়িক ভূদেব ছিলেন, বাল্যবিবাহের সমর্থক —'তাঁর কাছে স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ ছিল নারীর গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা; তিনি পরিবার পরিজন ব'লতে বাঙালী হিন্দু সংসারের যে নানা জনময় আত্মিক-সামাজিক কর্তব্যের বন্ধন বুঝতেন, সে-সব রুচি বা বিশ্বাস একালে অন্তর্হিত। সমকালীন বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে ভূদেব ছিলেন আপন বিশ্বাসে অবিচলিত,—তিনিও বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এই সব বৃত্তান্ত উল্লেখ ক'রে লিখেছেন যে, ভূদেব হিন্দু বাঙালীর গৃহ্যসূত্র রচনা ক'রে গেছেন।—'কিন্তু এখন অধিকাংশ হিন্দু বাঙালী কায়িক অর্থে ও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহহীন, কাজেই ভূদেবের 'গৃহ্যসূত্র' তাহার মনে রাখিবার কারণ থাকিতে পারে না।' ভূদেবের মৃত্যুর পরে শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছিলেন—'আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলার অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুকে দেখিয়াছি।' প্রমথবাবুর প্রবন্ধে[১৫] এই উক্তিটিও উদ্ধৃত হয়েছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের আগেই ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। তাঁর 'আচার-প্রবন্ধে' অথবা 'পারিবারিক প্রবন্ধে' তাঁর আচারনিষ্ঠার ভাবটি বিদ্যমান এবং ইতিমধ্যে আমাদের সমাজ যে সে-সব আচার একে-একে ত্যাগ ক'রেছে, তাও স্বীকার্য। অধ্যাপক বিশী এই দিকটি বিশেষভাবে ব্যখ্যা ক'রে লিখেছেন —'হিন্দু-আচারের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় তাঁহাকে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ করিয়া তোলে নাই তাঁহাকে উদার পরমতসহিষ্ণু করিয়াছে।' এই আচার-পালনের

১৫। 'ভূদেব-রচনা সম্ভার' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে সঙ্গে 'আন্তঃপ্রদেশিক সমবর্ণের বিবাহে' তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আচার-পালনের এবং পরিবার-বন্ধনের দায়িত্ব নির্বাহের পথেই সামাজিক যোগটি সম্পূর্ণ করবার পথ প্রশস্ত হবে বলে তিনি অনুভব করেন, এরকম অনুমান অসংগত নয়।

বিবেকানন্দের চিন্তায় এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আধুনিক বাঙালীর গৃহ-সূত্রের বর্ণনা পাওয়া যাবে আশা করা ঠিক নয়। তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে সমাজের নানা কথাই ব'লে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কথাটি হোলো সার্বিক আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। তিনি আহার এবং পানীয়ের কথাও বলেছেন,—যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র 'আহার ও পানীয়' নিবন্ধে। তবে, তাঁর সমাজ-চিন্তায় শূদ্র-জাগরণের ইঙ্গিতই হোলো একালের[১] বিশেষ কথা। ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী[১৬] এই কথার তাৎপর্য চিন্তার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' স্মরণ ক'রেছেন। বিবেকানন্দের 'My Plan of Campaign' প্রবন্ধটি আগেই স্মরণ করা হয়েছে। সেই প্রবন্ধেই তাঁর সমাজ-চিন্তার মূল সূত্রগুলি পাওয়া যায়। তাঁর আরো নানা উক্তিতে, রচনায় সমাজ-কথা ছড়িয়ে আছে। অযথা উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে অতঃপর আর একটি প্রসঙ্গ নিবেদন করি। প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফেরবার পরে, তিনি জগতের মূলে অন্ধকার এক শক্তির উপলব্ধিতে বিভোর হ'য়ে 'Kali the Mother' কবিতাটি রচনা করেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর পূর্বোক্ত নিবন্ধে

যে সহাস্য বিবেকানন্দের রূপ দেখিয়েছেন, তখন কিন্তু সে-বিবেকানন্দ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যেও অন্তর্হিত। তখন—

The stars are blotted out
The clouds are covering clouds.

মনে প্রশ্ন জাগে—এ অনুভূতি কি জগৎব্যাপী শূদ্রপীড়নের বেদনার দান? এ কি য়ুরোপ-আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় ভারতের আর্থিক দারিদ্র্যের যন্ত্রণাবোধ?

'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে এই কবিতাটির অনুবাদ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তারই কয়েক ছত্র উল্লেখ ক'রে সমাজচিন্তায় বিবেকানন্দের জীবনের শেষ প্রহরটির প্রকৃতি অনুমান করা চলে। তিনি বলেন—

'সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোর-রূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে…'

অরবিন্দ, নিবেদিতা, গান্ধী—এবং এঁদের কিছু আগে মহারাষ্ট্রের তিলকও নিজেদের সাধ্যানুসারে বিবেকানন্দের এই বেদনা বুঝেছিলেন। শোনা যায়, তিলককে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হ'য়ে বাংলার কর্মক্ষেত্রে নামবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের এই কবিতা রচিত হবার আগেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিলক মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী-উৎসব' করেছেন। 'সার্বজনিক গণপতি পূজাও প্রবর্তিত হয়েছে। সেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই পুণায় কংগ্রেস-অধিবেশনে তরুণ গোখ্‌লে বলেছেন—ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনে এক জাতীয়তার বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এদিকে সেকালের কংগ্রেস-রাজনীতির অনুসৃত মডারেট-পন্থার বিরুদ্ধে দেয়ালের লিখন ছিল—এসব সময়ের প্রায় দুই দশক আগের রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তে:—'বিসমার্ক এবং গর্শাকফ…বৃষের দরের পলিটিশ্যন; আর উলসী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিশ্যন'। আয়ার্লাণ্ডের

বিদ্রোহী নেতা পার্নেলের মৃত্যুতে (১৮৯৬) শোকার্ত অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদায় (১৮৯৩-১৯০৬)। বিবেকানন্দ যে-বছর শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন, সেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই অরবিন্দ দেশে ফিরেছেন এবং 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধে (২১ আগষ্ট ১৮৯৩) তিনি লেখেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ নেই—এবং আমাদের আসল শত্রু বাইরে কোথাও নেই,—সে আমাদের নিজেদেরই অন্তর্লীন—'our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism'। তাঁর চতুর্থ প্রবন্ধে (১৮, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) তিনি বিশেষ ভাবে ফ্রান্সে সর্বহারাদের আত্মশক্তি অর্জনের সংগ্রামের কথা তোলেন,—আয়ার্লাণ্ড, ইটালি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের উদাহরণ দেন।[১৭] আবার মনে পড়ে, নিবেদিতাও সেই আয়ার্লাণ্ডের দুহিতা! পার্নেলের নামে হয়তো তাঁরও মনে সম্মোহন ঘটতো। য়ুরোপ-আমেরিকা দেখে, দেশে ফিরে বিবেকানন্দ ঐ যে 'মৃত্যুরূপা মাতা' লিখেছিলেন, সেই কবিতাটির জন্মলগ্নের কথা ভাবতে গেলে শক্তিপূজায় দেশ-বিদেশের সমকালীন এইসব ঘটনা এবং অনুভূতির কথা মনে পড়ে। গিরিজাশঙ্কর দেখিয়েছেন যে, আয়ার্লাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতের সমবেদনার সূচনা রামমোহন থেকেই,—ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর 'মিরাত-উল-আকবর' পত্রিকায়। কিন্তু সে আমাদের মূল প্রসঙ্গের দূরবর্তী। অতএব সে-কথা থাক।

এ দেশের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে জীবনের শেষ পর্বে বিবেকানন্দ যে পূজার কথা ভেবেছিলেন, সে অবশ্যই অদ্বৈতের ধ্যান। কিন্তু তাঁর সেই ভূমাবোধের ফলে তাঁর সাহিত্যে যে রস চরিতার্থ হয়, দুঃখের করাল আবর্তই ছিল তার উদ্দীপন-বিভাব। সমাজ-সচেতন বিবেকানন্দই জাতিকে শুনিয়ে গেছেন—

পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।

উপস্থিত আলোচনায় এর আগেই ১২২-২৩ পৃষ্ঠায় এসব কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে। অলমতিবিস্তরেণ।

১৭। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' (১৯৫৬)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী দ্রষ্টব্য।

নির্ঘণ্ট